অসুখলতার ফুল

সমরেশ মজুমদার

পরিবেশক ঃ
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭৩

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৫৫

স্বত্বাধিকারী :
অভিযান গোষ্ঠীর পক্ষে সচিব,
বিদ্যানন্দ চৌধুরী,
১০৫ জি, টি, রোড, বর্ধমান

প্রকাশক :
শ্যামল চক্রবর্তী

মুদ্রণ :
ইন্দ্রনাথ দাশ
কো - আপারেটিভ প্রেস,
১০৫ জি, টি, রোড, বর্ধমান

মুদ্রণ সহযোগিতায় :
কম্পু - কালার,
৬এ, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা

(লেসার কম্পোজ)
ইলেক্ট্রো গ্রাফিক্স
২২, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা - ৭৩

(প্রচ্ছদ মুদ্রণ)
টাইপো গ্রাফিকস আর্ট
পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা - ৯

(লেমিনেশন)
চৌধুরী কনসা
৫৭/২ই, কলেজস্ট্রীট কলিকাতা - ৭৩

প্রচ্ছদ : সমর মুখোপাধ্যায়

অসুখলতার ফুল

ঘুম ভেঙেছিল অনেক আগেই তবু সপ্তাহের এই একটা দিন বিছানায় পড়ে থাকলে কেউ কিছু বলবে না। এই একটা দিন সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। যা ইচ্ছে তা সে করতে পারে, কিন্তু মুশকিল হল, অন্য কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। সে শুধু শুয়ে থাকতে পারে। ঘুম ভেঙে গেলে বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজনটা একটু একটু করে জানান দিতে থাকে। সেটাকে উপেক্ষা করে করে যখন আর শুয়ে থাকা যায় না, তখন উঠে বসে। এই ঘরে আটটি শোওয়ার চৌকি আছে। চৌকির ওপর রবারের আস্তরণ। তার ওপর চাদর, বালিশ। এখন গরমকাল তাই লেপ-কম্বলের প্রয়োজন হয় না। বাকি সাতটা বিছানা চমৎকার গোছানো। না গুছিয়ে উপায় নেই। মালিক কোনও একটা ছুতোয় ওপরে আসবেই আর তখন তাঁর চোখ খুঁজবে কোথায় খুঁত ধরা যায়। ঘড়ি দেখল সে, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। সাতজনই এখন নীচে কাজে লেগে গেছে। প্রথমে রেস্টুরেন্ট এবং কিচেন পরিষ্কার করতে হবে। গতকালের নোংরা টেবিলক্লথ লন্ড্রিতে পাঠাতে হবে, এঁটো প্লেট-গ্লাস ডিশ-ওয়াশার থেকে বের করে ভাল করে ধুয়ে মুছতে হবে। ইতিমধ্যে বাজার এসে যাবে। সেগুলোর ব্যবস্থা করে রান্নার প্রাথমিক আয়োজন শেষ করতে করতে বেলা এগারোটা। এরই ফাঁকে ব্রেকফাস্ট সেরে নেবে সবাই। এগারোটায় কিচেনআন্টি এসে কিচেনের হাল ধরবেন। তখন সবাই স্নান সেরে ইউনিফর্ম পরে তৈরি হবে। রেস্টুরেন্ট খুলবে দুপুর বারোটায়, বন্ধ হবে রাত বারোটায়।

রেস্টুরেন্টের ওপরে শোওয়ার ঘরে দাঁড়ালে সিলিং প্রায় মাথায় ঠেকে যায়। বিনি পয়সায় এমন থাকার জায়গা দিয়েছেন বলে মালিক প্রসঙ্গ উঠলেই কথা শোনান। এই এলাকায় এর তিনভাগের একভাগ ঘরের ভাড়া শুনলে পেট গুড়গুড় করে। একটাই দরজা, জানলা নেই। গরমকালে একটু কষ্ট হলেও শীতকালে স্বর্গ বলে মনে হয়। মুশকিল

হল টয়লেট-বাথরুম নীচে। রেস্টুরেন্টের তলায় মাটির ঘরে। খাড়া সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে হয়। সেখানে নেমে জলবিয়োগ করার পর শরীর হালকা লাগল। আয়নায় মুখ দেখল সে। মালিকের নির্দেশ, রোজ দাড়ি কামাতে হবে। যারা দাড়ি রাখে তারা এই রেস্টুরেন্টে কাজ পায় না। এখন মুখটা জলে ধুয়ে নিয়ে স্নানের সঙ্গে ব্রাশ করবে বলে ঠিক করল সে। তারপর আঙুলগুলো চুলের ভেতর ঢুকিয়ে মাথাটাকে ভদ্রস্থ করে ওপরে উঠে এল। এখন ব্রেকফাস্ট না করলে লাঞ্চের আগে খাবার জুটবে না। শোওয়ার ঘরে ফিরে না গিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকল সে।

রেস্টুরেন্টের চেয়ার টেবিল ঠিকঠাক সাজিয়ে ফেলেছে ওরা। মালিকের এখন থাকার কথা নয়, কিচেনআন্টিও আসেনি। বারোটার আগে রেস্টুরেন্টের মূল দরজা খুলবে না। পাশের সরু প্যাসেজ দিয়ে যাতায়াত করে সবাই।

'এত তাড়াতাড়ি উঠলি যে?' কাউসার হেসে জিজ্ঞাসা করল।

'ঘুম ভেঙে গেল।' একটা পাত্র থেকে ডিমের ভুজিয়া আর পরোটা প্লেটে তুলে নিয়ে চিবোতে চিবোতে উত্তর দিল সে।

'এ শালার খিদে পেয়ে গিয়েছিল। ওই পরোটা ভুজিয়া আমি তোর জন্যে রেখে দিয়েছিলাম।' ফারুক মেঝেতে ব্রাশ করতে করতে চেঁচাল।

রনি কাউসারের দিকে তাকাল, 'মৈমনসিং-এর লোক ঠিক কাকের মতো। যেখানেই থাক কা কা করে চেঁচাবে।'

ফারুকের গলা চড়ল, 'তোরা কী রে? বরিশালি মাল। অ্যাই, তোরা বরিশালের সেই গল্পটা জানিস?' বাকিদের দিকে তাকাল সে।

সবাই কাজ থামিয়ে দিল। একজন বলল, 'কী গল্প?'

এগিয়ে এল ফারুক, 'তিন ছেলে জঙ্গলের ধারে জমিতে চাষ করতে যায় ভোর হলেই। দুপুরে এসে পুকুরে ঝাঁপ দিয়েই খেতে বসে যায়। ওদের মা তিনটে থালা পাশাপাশি রেখে পরিবেশন করে। একদিন মা দেখল মেজ আর সেজ এসে খেতে বসেছে। তাদের ভাত দিয়ে মা জিজ্ঞাসা করল, 'তোদের বড়ভাই আসে না কেন? কোথায় গেল সে?'

মেজভাই ভাত মুখে পুরতে পুরতে বলল, 'ছাওলে (বাঘে) নিয়ে গেছে।'

মা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, ‘নিয়ে গেল? বড় ভাল ছিল রে। নে, আর একটু ভাত নে।’

সবাই হেসে উঠল। কাউসার বলল, ‘যাঃ। ছেলের শোক ভুলে ভাত দিতে চাইল?’

ফারুক মাথা নাড়ল, ‘সত্যি। বরিশালের লোকের হৃদয় খুব কম নরম হয়। আমাদের রনিসাহেব অন্যরকম হবে কী করে!’

ঝগড়া নয়, স্রেফ মজা করার জন্যে বলা। খারাপ লাগে না শাহিনের। এইরকম কথায় নামগুলো তো শোনা যায়! ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, আহা!

‘নাস্তা তো খাইলা, এখন কী করবা শাহিনভাই?’ আকবরভাই জিজ্ঞাসা করল। এই রেস্টুরেন্টের সবচেয়ে পুরনো কর্মী হল আকবর। ওই একজন লোককেই মালিক যা একটু বিশ্বাস করে। আবার মালিক যাকে বিশ্বাস করে তাকে সহকর্মীরা সন্দেহ করে। তারা কী বলছে বা ভাবছে তা মালিকের কানে না তুলে দেয়। কিন্তু এ কথা সামনাসামনি বলার সাহস কারও নেই। শাহিন বলল, ‘ঘরে যাব। একটা চিঠি লিখতে হবে বাসায়।’

‘বাসায়! বাসায় কে কে আছে?’

‘সবাই। আব্বু-আম্মু, দুই বড়ভাই, এক ছোটভাই। এক বোন।’

‘বিয়া তো করো নাই?’

লজ্জা পায় শাহিন, ‘কী যে বলেন!’

‘লাভার নাই? প্রেমিকা?’

‘নাঃ। ওই সব চিন্তা মাথায় তখন ছিল না।’

‘এখন আসছে?’

‘ধ্যাত।’ সরে এল শাহিন। আকবরভাই কখনও তার সঙ্গে এরকম হালকা কথা বলে না। প্রায় বড়ভাই-এর বয়সি লোকটা। এখন ধমক দিচ্ছে দুই সিলেটিকে। কিচেনে কাজ করে ওরা। কিচেনআন্টির ডান-হাত বাঁ-হাত। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বললে কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। ময়মনসিংহ বা বরিশালের ভাষা দূরের কথা, ওরা ফরিদপুর ঢাকার ভাষাও ভাল করে বলতে পারে না। কিচেনআন্টি যে কী করে ওদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেন তা তিনিই জানেন! এই রেস্টুরেন্টে

তার সমবয়সি রনি। বিক্রমপুরে বাড়ি। এমনিতে বেশ ভাল কিন্তু ছুটি পেলেই বাইরে যাওয়ার জন্যে মুখিয়ে থাকে। মালিক তাদের বারংবার সতর্ক করেছে। বাইরে গিয়ে কেউ যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, তা হলে মালিক তাকে ছাড়াতে যাওয়া দূরের কথা চিনতেই পারবে না। এ দেশে কাগজ ছাড়া থাকা যেমন অপরাধ, তেমনি তাদের যারা চাকরি দেয় তাদেরও অপরাধী বলে মনে করা হয়। পুলিশের হাতে ধরা পড়া মানে কী হবে তা নিয়ে কারও স্পষ্ট ধারণা নেই। কেউ বলে সারাজীবন জেলে পচে মরতে হবে, কেউ বলে বরফের দেশে রাস্তা পরিষ্কার করার কাজে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেই ভয়ংকর ঠান্ডায় মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু রনি পুলিশের ব্যাপারটাকে পাত্তাই দিতে চায় না। তার কথা হল, লক্ষ লক্ষ মানুষ নিউইয়র্কের রাস্তায় প্রতিদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের মধ্যে কার পকেটে বৈধ কাগজ নেই তা পুলিশ কী করে জানতে পারবে? ইতিমধ্যে সে আমেরিকানদের মতো উচ্চারণে ইংরেজি বলা প্রায় রপ্ত করে ফেলেছে। চট করে তাকে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। তা ছাড়া যে সব জায়গায় ঢুকতে গেলে বা কোনও কাজ করতে গেলে আইডেন্টিটি কার্ড দেখাতে হয় সে সব এড়িয়ে গেলেই হল। সাপ্তাহিক ছুটি পেলে বিকেল তিনটে পর্যন্ত রনি ঘুমায়। তারপর স্নান সেরে দাড়ি কামিয়ে সবচেয়ে ভাল জামাটা জিনসের ওপর পরে বেরিয়ে যায়। ফেরে রাতদুপুরে। রেস্টুরেন্ট বন্ধ হওয়ার পর। পরদিন সকালে কাজ করতে করতে গল্প করে তার, কোনও মেয়ের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর সে কী কী করেছিল। তাকে ভাল রেস্টুরেন্টে খাইয়েছে, তার বাড়িতে গিয়েছে। গত সপ্তাহে দু'বার চুমু খেয়ে চলে এসেছিল প্রথম আলাপ হয়েছিল বলে। এ সপ্তাহে কোনও কিছু বাদ রাখেনি। রনির কথা, 'বুঝলা, এত মজা যে কী বলব, মেমসাহেবদের শরীর তো দ্যাখো নাই, আহা।

'ওই মেমসাহেবকে বিয়া করবা নাকি?'

'পাগল। আর ওই রাস্তায় এক বছরের মধ্যে যাওয়া নাই। সামনের সপ্তাহে অন্যদিকের দূরের রাস্তায় যেতে হবে। এক বছরে ছাব্বিশটা মেয়ে নিউইয়র্কে কিছু না।'

‘কত খরচ পড়ল?’

‘ষাট ডলার।’

‘অ্যাঁ।’ চমকে উঠল শাহিন কাজ করতে করতে। হাঁ হয়ে গেল সে।

‘আমি ব্যাবসা করি, তার কম খরচ করলে মেয়েটার সন্দেহ হবে না?’

‘প্রায় দুই-আড়াই’শ ডলার? দেশে কত পাঠাও?’

‘চারশো। আরে পাই তো সাতশো আশি। ফিফটি পার্সেন্ট দেশে পাঠালে, আড়াইশো নিজের ফুর্তির জন্যে খরচ করা কি পাপ?’ রনি জিজ্ঞাসা করেছিল।

‘মেয়েগুলোকে তুমি ঠকাচ্ছ?’

‘একদম না। ওরা একা মেয়ে। একটু মজা পায়। তুমি চলো একদিন। মালিককে ম্যানেজ করে একদিনেই দু’জনের ছুটি করে দিতে পারে আকবর ভাই।’

‘না না। আমাকে মাসে সাতশো পাঠাতেই হয়। দেশে গিয়ে তা কাটাকাটি করার পরে আব্বুর হাতে পঁয়তাল্লিশ হাজার হয়ে পৌঁছায়। আমাদের বড় সংসার, খরচ অনেক।’ শাহিন বলেছিল।

‘তোমাদের আব্বু নিজে কখনও পঁয়তাল্লিশ হাজার একসঙ্গে দেখছে।’

‘না।’

‘আঠাশ হাজার পেলেই হাত তুলে নাচবে।’

‘না। আমি লিখেছি, আম্মুকে প্রতি মাসে একখানা গয়না কিনে দিতে।’

‘বাঃ। তোমার হাতে থাকে মাত্র আশি ডলার। তাতে মাস চলে?’

‘কেন চলবে না? থাকা-খাওয়ার খরচ নেই। তেল সাবান টুথপেস্ট আর দাড়ি কামাবার ব্লেড। মাসে এক রাত সিনেমায় যাই। তারপরেও অনেক ডলার বেঁচে যায়।’

আজ শাহিনের ছুটির দিন। বাকিরা কাজ করবে রাত বারোটা পর্যন্ত। ওপরে গিয়ে দেশে চিঠি লিখতে হবে। কিন্তু এখনই ওই ইচ্ছেটা প্রবল হল না। সারা দিন, সারা সন্ধে তো আছেই। সে পাশের দরজা দিয়ে

প্যাসেজে চলে এল। কয়েক পা হাঁটতেই রেস্টুরেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। অবিরত গাড়ি যাচ্ছে রাস্তার দু'পাশ দিয়ে। ফুটপাতে লোক নেই। রেস্টুরেন্টের পাশের দোকানটা গ্রসারির। একদিন ঢুকেছিল শাহিন। যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায়। দোকানের মালিক ইন্ডিয়ান কিন্তু তিনজন মেক্সিকান সেলসের কাজ করে। সবজির কাউন্টারে গেলে খুব ভাল লাগে। এত টাটকা আর বড় সাইজের বেগুন, পটল সে দেশে কখনও দেখেনি।

দেশে দেখার মতো কিছুই ছিল না। যা চাষ হত তাই দিয়ে পেট ভরাতে হত। বড় ভাইয়ের ছিল মাছ ধরার নেশা। বিলে চলে যেত সকাল হতে না হতে। দশটার মধ্যে একরাশ পুঁটি, বাচ্চা মেনি ধরে নিয়ে আসত জাল ফেলে। তাই দেখে আম্মু খুব খুশি হত। ডাল ভাত আলুভর্তার সঙ্গে ওই মাছের ঝাল সবাই তৃপ্তির সঙ্গে খেত। আব্বু বলত, 'বড় মজা লাগল মেনি খেয়ে। যদি সাইজটা একটু বড় হয়, তা হলে আলাদা ঝোল করলে আরও মজা লাগবে, যেদিন বড়ভাই কোনও কারণে মাছ পেত না, সেদিন আম্মুর মুখ শুকনো হয়ে যেত। পিঁড়িতে বসে মাথায় হাত দিয়ে কেবলই বলত, 'হায় রে। আজ আর গলা দিয়া ভাত নামবে না।' আব্বু ধমকাত, 'চুপ করো। গরিবের ঘরে যা পাওয়া যায় তাই অমৃত। মরিচ দাও। ডইল্যা খাক সবাই।'

বাঁ-দিকে মুখ ঘুরিয়ে শাহিন দেখল একটি মেয়ে শরীর নাচিয়ে আসছে। মেয়েটা বেশ লম্বা কিন্তু বুক বেশ ভারী। কোমর সরু। জিনস চেপে বসেছে দুই থাইতে তাই ওরা প্রকট। মুখটা বেশ মিষ্টি। এই সকালেই চুলে স্টাইল করেছে খুব। জুতোর হিলে নিশ্চয়ই স্টিল লাগানো আছে তাই খট্ খট্ শব্দ ছড়াচ্ছে সেদুটো। শাহিন রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। এটাও ঠিক, বাংলাদেশের কোনও গ্রামে তো নয়ই, শহরেও এরকম মেয়ে হাঁটলে লোকজন হাঁ করে পেছন নিত।

'এক্সকিউজ মি!' সুরেলা গলায় কথাটা ছুড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিলের আওয়াজ থামল।

শাহিন তাকাল। তাকিয়েই রাস্তার দিকে মুখ ঘোরাল। বুকের ভেতর যেন বাতাস আটকে গিয়েছে তার। এই মেয়ে নিশ্চয়ই অন্তর্বাস পরেনি,

নইলে খোলা বোতামের আড়াল সরে বুক অতটা উন্মুক্ত হবে কী করে!

'এক্সকিউজ মি!' মেয়েটি আবার বলল।

অতএব মুখ না ফিরিয়ে শাহিন বলল, 'ইয়া।' তার পরেই শুধরে নিল, 'ইয়েস!'

'আই নিড এ লাইটার।'

'আই ডোন্ট স্মোক!'

'শিট!' মেয়েটি তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। শাহিন দেখল, ওর পশ্চাদ্দেশে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। তার পকেটে যদি লাইটার থাকত—!

এইসময় গাড়িটা এসে দাঁড়াল ফুটপাত ঘেঁষে। ড্রাইভারের সিট থেকে নেমে মালিক চিৎকার করল। 'অ্যাই হারামজাদা, মেয়েমানুষ দ্যাখস? মেয়েমানুষ? দিনদুপুরে দুকানের সামনে খাড়া হয়ে মেয়েমানুষ দ্যাখার মতো বুকের পাটা কী করে হয় তোর? পুলিশ যদি ধরে তা হলে আমি বলব, চিনি না। জিন্দেগিতে দেখি নাই। মর শালা জেলে গিয়ে।'

রাগ এল মনে। সে কাঁপা গলায় বলল, 'আপনি ভুল বলতেছেন।'

'ভুল?'

'হ্যাঁ। আমি এইমাত্র বাইরে আসলাম। কোনও কিছু দেখতে আসিনি।'

'কেন আসলি? অর্ডার আছে দিনের আলোয় বাইরে না আসার? আছে কিনা?'

'আছে।'

'তো? দ্যাখ, আমি যা বলি তোদের ভালর জন্যে বলি। যখন প্রথম আসলি তখন তো তোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত জংলি গন্ধ। আমি তোকে মানুষ করছি, ইংরেজি শিখাইছি, ম্যানার শিখাইছি। কেন? না, তোর ভালর জন্যে।' মালিক গাড়ির পেছনে গিয়ে ডিকি খুলল, 'যা, নিয়া যা মালগুলা।'

এটা তার কাজ নয়। আজ তার ছুটির দিন। রেস্টুরেন্টের কোনও কাজ করার কথা নয়। এই মুহূর্তে মালিককে অস্বীকার করার ক্ষমতা তার

নেই। রাগের মাথায় যদি মালিক বলে দেয় 'ফায়ার' তা হলে আবার ভাসতে হবে। নিউইয়র্ক শহরের যে-কোনও বাংলাদেশি দোকানে গেলে প্রশ্ন করবে, 'আগে কোথায় কাম করতেন?' মিথ্যে বললে ধরা পড়বেই। সত্যি বললে মালিককে ফোনে জিজ্ঞাসা করবে কোন দোষে তাকে ছাড়ানো হয়েছে। মালিক যা হয়নি তাও ওর বিরুদ্ধে বলবে। ফলে কাজ পাওয়া গেলেও ডলার কমবে। একে উইদাউট পেপার তার ওপর খারাপ রিপোর্ট। এখন যা পাচ্ছে তা থেকে অন্তত পঞ্চাশ সেন্ট ঘণ্টায় কমাবে নতুন দোকানদার। শাহিন দু'হাতে ব্যাগ তুলতেই মালিক বলল, 'তোকে আর আসতে হবে না, রনিকে পাঠা।'

ব্যাগ দুটো ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে হাসল শাহিন। এতক্ষণে মালিকের খেয়াল হয়েছে আজ তার ছুটি। লোকটা এমনিতে খারাপ নয়। শুধু অর্ডার ভাঙলে খেপে যায়।

মন দিয়ে চিঠি লিখল শাহিন। লিখল, তার জন্যে যেন ওঁরা চিন্তা না করেন। সে খুব ভাল আছে। নিউইয়র্কের সবচেয়ে ভাল জায়গায় চাকরি করছে। চারবেলা মাছ-মাংস খাচ্ছে। তবে আম্মুর হাতের রান্না অনেক অনেক মজার। 'আপনার আগের চিঠিতে জানলাম বাড়ির দোতলা উঠছে। আপনি আর আম্মু যেন দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরে থাকেন। আপনি লিখেছেন রহমতচাচার জমি এবং পুকুর বিক্রির জন্যে আছে। দেরি না করে রহমতচাচাকে অগ্রিম টাকা দিন। আমার পাঠানো টাকায় তার দাম কয়েক মাসেই মিটিয়ে দিতে পারবেন। আপনারা সবাই ভাল থাকলে আমি খুশি হব। পুত্র হিসেবে এই যে কর্তব্য করতে পারছি তা আল্লারই অনুগ্রহে। আপনি জানতে চেয়েছেন আমার ঠিকানা গ্রামের মানুষ জানতে চায়। তারা তাদের ছেলেদের এ দেশে চাকরি করতে পাঠাতে চায়। কিন্তু আব্বু, ব্যাপারটা খুব কঠিন। তাই কাউকে আমার ঠিকানা না দেওয়াই ভাল। আপনি লিখেছেন, কবে আমি দেশে ফিরব! এখানকার কাজে সহজে ছুটি মেলে না। অন্তত পনেরো দিন ছুটি পেলেই আপনাকে জানাব।' এই অবধি লেখার পর হঠাৎ বুকের ভেতর থেকে ঝড়ের মতো সব কান্না গলায় ছুটে এসে ছিটকে বের হল মুখ দিয়ে।

বালিশে মুখ চেপে সে চেষ্টা করতে লাগল শব্দটাকে চাপা দিতে। সমস্ত শরীর থরথরিয়ে কাঁপছে। মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা লিখতে হচ্ছে, না লিখে উপায় নেই। চোখের সামনে দুটি সরল চেহারার বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখ ভেসে উঠল। প্রথম মাসে হাতে টাকা পেয়ে আব্বু লিখেছিল, 'তুমি আমাদের নতুন জন্ম দিয়াছ। পিতা হিসাবে আমি যা করিতে পারি নাই তা তুমি পুত্র হইয়াও করিলে।'

তবু মিথ্যে কথা লিখতে হল। আব্বু-আম্মু, ভাইরা জানে শাহিন আমেরিকায় গিয়েছে চাকরি করতে। মোটা টাকা মাইনে পায় বলেই মাকে অত টাকা পাঠাতে পারে। গর্বে আব্বুর বুক চওড়া হয়েছে। যাঁকে কেউ পাত্তা দিত না তাঁকে আজ সমীহ করছে সবাই। গ্রামের পুরনো মসজিদটাকে নতুন করে তৈরি করতে লাখ দেড়েক টাকা লাগবে। আব্বু তাকে লিখেছিল, ওই বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া যায় কিনা। তার উত্তরে সে জানিয়েছিল, যে-টাকা সে পাঠাচ্ছে তা দিয়ে আব্বু ইচ্ছেমতো যা খুশি তাই করতে পারে, তাকে জানাবার প্রয়োজন নেই। এই অবস্থায় সে কী করে লিখবে আমেরিকায় তাকে সারাজীবন থাকতে হবে চোরের মতো, কোনওদিন দেশে ফিরতে পারবে না! কী করে সে লিখবে, সে একটা রেস্টুরেন্টে বেয়ারার চাকরি করে! সত্যি কথা জানলে ভেঙে পড়বে আব্বু-আম্মু। সেটা সে কিছুতেই হতে দিতে পারে না। তাই মিথ্যে কথা লিখতে হবে, লিখে যেতে হবে।

যার ছুটি থাকবে তার রেস্টুরেন্ট খুললে নীচে যাওয়ার হুকুম নেই। লাঞ্চ-ডিনার কেউ না কেউ ওপরে পৌঁছে দিয়ে যায়। সন্ধের পরে ঘুমিয়ে ছিল শাহিন। রনি এসে ওকে ঘুম থেকে তুলে খাবারের প্যাকেট দিয়ে বলল, 'কেল্লা ফতে গুরু।'

'মানে?'

'সে এসেছে।'

'কে?'

'আমার স্বপ্নের রানি, দিল কা ধড়কন। গত সপ্তাহে এসেছিল একটা শুড্ডার সঙ্গে। আমার দিকে চারবার মুচকি হাসি হেসেছিল। একবার রুমাল ফেলে দিয়েছিল কার্পেটের উপর। আমি এগিয়ে গিয়ে তুলে দিলে

বলেছিল, সো নাইস অফ ইউ। আরে, আমি তো আমেরিকান মেয়েদের চিনি, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গিয়েছি। কিন্তু গম্ভীর হয়ে সরে গিয়েছিলাম। আজ আবার এসেছে। আজ অন্য একটা হাড়গিলাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমি কোন টেবিলের চার্জে আছি। দেখিয়ে দিতে সেখানে গিয়ে বসেছে। হাড়গিলা নিজের জন্যে ব্র্যান্ডির অর্ডার করল। সুন্দরী ভাবল একটু, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কী ড্রিঙ্ক নেব তুমি ঠিক করে দাও।' আনন্দে একপাক ঘুরে নিল রনি। 'আমি অ্যানাউন্স করছি, নেক্সট ছুটির দিন যা হওয়ার তাই হবে। যাই।' দরজার দিকে পা বাড়াচ্ছিল সে, শাহিন তাকে থামাল।

'শোনো, এই খামটা মালিককে দিতে হবে।'

খামটা তুলে দেখল রনি, 'জনাব মেচবাহারুদ্দিন আহমেদ, গ্রাম তিলপুর, জেলা ফরিদপুর, বাংলাদেশ।' হাসল সে, 'এই খাম বাংলাদেশে যাবে, আমরা যেতে পারব না। তাতে অবশ্য আমার কিছু যায় আসে না।' রনি নেমে গেল।

ধোপদুরস্ত ইউনিফর্ম পরে বারোটা বাজার আগেই সবক'টা টেবিল তৈরি করে ওদের রেস্টুরেন্টের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে যেতে হয়। মালিক দরজা খুলে কাউন্টারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় কোথাও কোনও খামতি আছে কিনা।

আজ দেখে নেওয়ার পর মালিক রনিকে ডেকে বলল, 'আজ তোমাকে কোনও টেবিল অ্যাটেন্ড করতে হবে না। কাল তোমার ফাতরামি আমি দেখেছি।'

'ফাতরামি? কী ফাতরামি করলাম?' রনি প্রশ্ন করল।

বেশ কড়া কথা বলতে গিয়েও কাস্টমার ঢুকছে দেখে মালিক মুখে হাসি ফোটাল, 'গুড আফটারনুন মিস্টার স্মিথ, ওয়েলকাম।'

মিস্টার স্মিথ রেস্টুরেন্টে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে হাসলেন, 'মনে হচ্ছে আজ আমি আপনার প্রথম খদ্দের। প্রার্থনা করছি আজ ব্যাবসা যেন খুব ভাল হয়।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ। কোথায় বসবেন তা আপনি পছন্দ করুন।'

এগিয়ে এসে কাউন্টারের ওপাশে লম্বা টুলগুলোর একটায় বসে মিস্টার

স্মিথ বললেন, 'আপাতত এখানে বসে একটা বিয়ার খাওয়া যাক।'

'শিয়োর।' মালিক বিয়ারের ক্যান খুলে লম্বা গ্লাসে ঢেলে এগিয়ে দিলেন, 'মিসেস স্মিথ কেমন আছেন?'

'ওহো! তিনি তো আমার সঙ্গে আর থাকেন না। আমরা আলাদা আছি।'

কাঁধ নাচাল মালিক। কাস্টমারদের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে কখনই তিনি কথা বলেন না। এটা তাঁদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। বিয়ারে চুমুক দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন মিস্টার স্মিথ। রনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওঁদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'আমি এখন কী করব?'

'কেউ ড্রিঙ্ক অর্ডার করলে তুমি তা সেই টেবিলের ওয়েটারকে দিয়ে আসবে। আর যে সব কাস্টমার উইদাউট লেডিস রেস্টুরেন্টে আসবে, তুমি তাদের টেবিল অ্যাটেন্ড করবে।'

'তা হলে তো আমাকেই বেশি খাটতে হবে।'

'কাল ফাতরামি করার সময় মনে রাখা উচিত ছিল। গুড আফটারনুন ডক্টর শর্মা। আপনি কবে ফিরেছেন?'

মিস্টার শর্মা একজন প্রবীণ মানুষ। হেসে বললেন, 'গতকাল। আজকের স্পেশ্যাল কী?'

'প্লিজ টেবিলে চলে যান। আজ স্পেশ্যাল চিংড়ির ডিশ। খুশি হবেন খেয়ে।' মিস্টার শর্মা রেস্টুরেন্টের ভেতরে পা বাড়াতেই মালিক রনিকে ইশারা করলেন ওঁকে অ্যাটেন্ড করতে। যে টেবিলে মিস্টার শর্মা বসলেন, সেখানকার দায়িত্বে ছিল ফারুক। সে এগিয়ে যাচ্ছিল হাসিমুখে, পেছন থেকে রনি তাকে ডাকল, 'মেয়েমানুষ সঙ্গে না থাকলে আমার ডিউটি। বহুত হারামি এই মালিকটা।'

ওদিকে তখন মালিক মিস্টার স্মিথকে গলা নামিয়ে বলছেন, 'ভেরি ফেমাস সায়েন্টিস্ট। পোল থেকে ঘুরে এলেন, বুঝলেন মিস্টার স্মিথ, আমার এই রেস্টুরেন্টে কমন ইন্ডিয়ানরা ঢুকতে সাহস পায় না। আপনি তো নিজেই দেখেছেন, অল আমেরিকান কাস্টমার। কয়েকজন ইন্ডিয়ান যাঁরা এখানে আসেন তাঁরা হয় বিজ্ঞানী, নয় অধ্যাপক অথবা নাম করা সার্জেন। হে হে হে।'

মিস্টার স্মিথ বিয়ার গলায় নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী নাম ভদ্রলোকের?'

'ডক্টর হনুমানপ্রসাদ শর্মা।' মালিক বললেন।

একটা বাজতে না বাজতেই রেস্টুরেন্ট গমগম করে। আজ রনির কপাল মন্দ। মাত্র তিনটে টেবিলে মহিলারা পুরুষসঙ্গীর সঙ্গে বসে খাচ্ছেন। ফলে বাকিগুলোতে চরকির মতো ঘুরতে হচ্ছে রনিকে। ওই সব টেবিলের ওয়েটাররা কিচেন থেকে খাবার এনে রনিকে দিচ্ছে, রনি সেগুলো টেবিলে পরিবেশন করছে।

শেষপর্যন্ত ফারুকদের অনুরোধে আকবর গেল মালিকের কাছে। ওরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখল প্রথমে খুব মাথা নাড়ল মালিক, শেষে হাত ওলটাল। আকবর ফিরে এসে জানাল, 'যে যার টেবিলের অর্ডার নাও। রনি, তুমি এক-দুই-তিন টেবিলে।'

রনি বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ আকবরভাই।'

বিকেল সওয়া তিনটের মধ্যে লাঞ্চ শেষ করে কাস্টমাররা বেরিয়ে যান। তখন রেস্টুরেন্ট প্রায় ফাঁকা। দু'-একজন আধা-মাতাল হুইস্কির গ্লাস নিয়ে বসে থাকে। তাদের নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা নেই। এখন আর ওয়েটারদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। কিচেনে গিয়ে একে একে খেয়ে নিয়ে সেখানেই বিশ্রাম নেয়। কিচেনআন্টি রনিকে দেখে হাসে, 'কেমন জব্দ?'

রনি মুরগি চিবোতে চিবোতে কাঁধ নাচায়। মুখে কিছু বলে না।

কাউসার জিজ্ঞাসা করল, 'কাল কী ফাতরামি করছিলা?'

'ছাড়ো তো। আমার মেজাজ গরম আছে!'

আকবরভাই বলল, 'এই জন্যে বলি, মেয়েমানুষ বহুত ডেঞ্জারাস।'

কিচেনআন্টি ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'আকবরভাই! আপনি আমেরিকায় আছেন। এখানে মেয়েদের অশ্রদ্ধা করে কেউ কথা বলে না।'

'আরে! আমি কী বললাম?' আকবর অবাক হয়।

'মেয়েমানুষ আবার কী?'

'মেয়েরা মেয়েমানুষ না?'

'তা হলে ছেলেদের ছেলেমানুষ বলেন না কেন?'

'অ। সরি ম্যাডাম। মহিলা, মহিলা বলব এখন থেকে।'

'থ্যাঙ্কস।' মুখ ঘুরিয়ে নিল কিচেনআন্টি।

মালিক রেস্টুরেন্টের খাবার খান না। যখন বাড়ি থেকে আসেন তখন হটবক্সে খাবার নিয়ে আসেন। রেস্টুরেন্ট খালি হয়ে গেলে কাউন্টারের পেছনের ছোট্ট ঘরে ঢুকে খেয়ে নেন। মালিকের হটবক্সে কী খাবার আছে তা জানতে সবার আগ্রহ আছে। কিন্তু ওই ছোট্ট ঘরে ঢোকার অনুমতি নেই। রনির মতে, 'স্যান্ডউইচ ছাড়া কিছু থাকে না। ওই মানুষ নিজের জন্যে পয়সা খরচ করতে পারে না। রেস্টুরেন্টের খাবার রেখে দেয় একজন কাস্টমারের জন্যে যে ডলার দেবে!'

শাহিন বলেছিল, 'তা হলে আমাদের খাবার দেয় কেন? বলতে পারত নিজেরা রান্না করে খাও। তা হলে তো ওঁর অনেক পয়সা বাঁচত।'

'রান্নার জায়গা কোথায়?' রনি জিজ্ঞাসা করেছিল।

আকবর বলল, 'দুর। প্রথম থেকেই ঠিক হয়েছিল কোনও কর্মচারী বাইরে থেকে আসবে না, এখানেই থাকবে। তাই খাবেও রেস্টুরেন্টের খাবার। শুধু কিচেনআন্টি বাইরে থেকে আসবে।'

দু'দিন পরে শাহিনের ডাক পড়ল মালিকের ঘরে।

কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে মালিক হিসেব করছিল কম্পিউটারে। শাহিন যেতেই জিজ্ঞাসা করল, 'দেশে যেতে ইচ্ছে আছে?'

হৃৎপিণ্ড আচমকা লাফিয়ে উঠল শাহিনের, দ্রুত মাথা নাড়ল সে।

'কীভাবে যাবে? পাসপোর্ট নেই, প্লেনে উঠবে কী করে?'

মুখ নামাল শাহিন। এ কী ধরনের রসিকতা? সমস্যাটার কথা সে জানত না?

'একটা পথ আছে।' মালিক বলল, 'কোনওদিন লটারির টিকিট কেটেছ?'

মাথা নাড়ল শাহিন, 'না।'

'গুড। তোমার লাক যদি খুব ভাল হয় তা হলে পাসপোর্ট-ভিসার কোনও সমস্যা থাকবে না। কে বলতে পারে কার কপালে কী লেখা আছে!'

'আমি বুঝলাম না।'

মালিক চোখ রাখলেন শাহিনের মুখে, 'লটারির কথা শোনোনি?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল শাহিন।

'কী শুনেছ?'

'লটারিতে নাম উঠলে আর পুলিশের ভয় থাকে না!' শাহিন বলল, 'কিন্তু কারও নাম নাকি লটারিতে ওঠে না!'

'রাবিশ! শোনো, ইউএসএ গভর্নমেন্ট জানে অনেক বিদেশি মানুষ এ দেশে বেআইনিভাবে আছে। তারা এখানে কাজকর্ম করে বেঁচে থাকে। এই যেমন তুমি। আমেরিকানরা আনস্কিলড প্রফেশনে আসতে চায় না। বোঝা গেল? আরে যে-সব কাজে বিদ্যাবুদ্ধি লাগে না, শরীরে শক্তি থাকলেও করা যায় সেগুলো করানো হয় ওই সব বিদেশিদের দিয়ে যাদের পাসপোর্ট নেই, বৈধ কাগজ নেই। তাই কোনও কোনও দেশের বেআইনি মানুষগুলোকে আইনি হওয়ার সুযোগ দিতে এখানকার গভর্নমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ইনভাইট করে। সেই সব অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে লটারি হয়। ধরা যাক, বাংলাদেশের লোকদের মধ্যে দশজনকে নেওয়া হবে। ওই দশজনকে গভর্নমেন্ট প্রথমে গ্রিন কার্ড দেয়। তারপর কয়েক বছর পরে ভাল রেকর্ড দেখলে সিটিজেনশিপ দিয়ে দেয়। গ্রিন কার্ড পেলেই তুমি ঢাকা হয়ে সোজা ফরিদপুরে চলে যেতে পারবে। অ্যাপ্লাই করবে?' মালিক হাসল।

'আপনি যা বলবেন—!'

'আরে অ্যাপ্লাই করতে দোষ কী! তোমার কপালে কী আছে তা তো তুমি জানো না।' মালিক একটা ফর্ম বের করল, 'এইখানে সই করো। ছয় মাস পর পর লটারি হয়। এবারে যদি নাম না ওঠে ছয় মাস পরের লটারির সময় এই অ্যাপ্লিকেশন ওরা কনসিডার করবে। নতুন করে অ্যাপ্লাই করতে হবে না। সই করো।'

বাড়িয়ে দেওয়া ফর্মটায় সই করল শাহিন। মালিক বলল, 'উইশ ইউ গুড লাক। তোমার যাবতীয় তথ্য আমার কাছে আছে। বাকি যা দরকার তা আমি জেনে ভরতি করে দেব। তোমাকে লিখতে দিলে তো কলম ভাঙবে। কাল ফার্স্ট আওয়ারে জমা দিয়ে দেব।'

'অন্যদের দিয়ে সই করাবেন না?' শাহিন জিজ্ঞাসা করল।

'অ্যাই!' চেঁচিয়ে উঠল মালিক, 'নিজেরটা ভাবো। যাও।'

মালিক তাকে পছন্দ করেছেন বলে এমনভাবে ডেকে সুযোগ করে দিচ্ছেন। সারাটা সন্ধ্যা প্রবল উৎসাহ নিয়ে কাজ করল শাহিন। সবাই, এমনকী কিচেনআন্টিও তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ এত ফুর্তি কেন?'

মুখ খুলতে গিয়েও খুলল না শাহিন।

শুতে শুতে রাত একটা। রেস্টুরেন্টের ওপরের এই চাপা ঘরে সবাই ঘুমোচ্ছে। কিন্তু শাহিনের ঘুম আসছিল না। কত লোক অ্যাপ্লাই করে? আমেরিকায় কত বেআইনি লোক আছে? সবাই খবরটা জানে? রনির তো জানা উচিত। তার খারাপ লাগছিল কাউসারের জন্যে। মালিক যেখান থেকে ফর্মটা এনেছে সেখান থেকে কাউসারের জন্যে ফর্ম আনানো যায় না? আকবরভাই এখানকার সবচেয়ে পুরনো কর্মী। তিনি নিশ্চয়ই জানবেন কোথায় ওই ফর্ম পাওয়া যায়। অ্যাপ্লাই করতে নিশ্চয়ই ডলার লাগে না, লাগলে মালিক তাকে বলত। তার জন্যে পকেট থেকে ডলার খরচ করার লোক মালিক নয়।

শাহিন চোখ বন্ধ করতেই নিজেকে দেখতে পেল। রেস্টুরেন্টে যে সব আমেরিকানরা আসে তাদের খুব কমজনই টাই পরে। কিন্তু টাই না পরলে সাহেব বলে মনে হবে না। সে দেখল নিজেকে। ইস্পাতনীল সুট, দামি জুতো, চমৎকার টাই, চোখে রোদচশমা পরে ঢাকার জিয়া বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলছে, 'ফরিদপুর।' 'কত ভাড়া দিবেন স্যার?' ট্যাক্সিওয়ালা বলল, 'হাজার টাকা লাগব। থাউজেন্ড রুপিস।'

'ওকে।'

ট্যাক্সির পেছনের সিটে বসে সে বাইরের প্রকৃতি যখন দেখবে তখন ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞাসা করবে, 'স্যার? কামিং ফ্রম আমেরিকা?'

'হ্যাঁ। আমি আমেরিকা থেকে আসছি।'

'আই বাপ! আপনি বাঙালি? আমি তো আপনারে সাহেব ভাবছিলাম।'

ট্যাক্সিটা এত ধীরে চলছিল যে কিছুতেই ফরিদপুর আসছিল না। উলটে ঘুম এসে গেল।

পরদিন লাঞ্চের পর রেস্টুরেন্ট ফাঁকা হলে শাহিন আকবরভাইকে খবরটা জানাল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড় হয়ে গেল আকবরভাই-এর, 'হায় আল্লা! করছ কী?'

'কেন?' ঘাবড়ে গেল শাহিন।

'চারদিন ছুটি নাও। ভাগো, পুলিশ আসবে যে-কোনও সময়।'

'বুঝলাম না।'

'লটারি হবে, লটারিতে যদি নাম ওঠে তা হলে তুমি শের। তার আগে তো লেংটি ইন্দুর। মালিক তোমার দরখাস্ত জমা দিলেই পুলিশের খাতায় নাম উঠে যাবে। শাহিন নামের এক ব্যাংলাদেশি উইদাউট পেপার অমুক রেস্টুরেন্টে কাম করতেছে। তারা বেআইনি মানুষ খুঁজে বেড়ায়, আর তুমি স্বেচ্ছায় বাঘের গুহায় পা রাখলা। তোমাকে এখানে এসে ধরবে আর জেলে ঢোকাবে।' আকবরভাই মাথা নাড়ল।

'মালিক নিশ্চয়ই জানে। তা হলে জেনেশুনে আমাকে বিপদে ফেলল?'

'জানি না। যাও, বলো ওরে!' আকবর ইশারায় দূরের কাউন্টার দেখিয়ে দিল।

পায়ে পায়ে মালিকের সামনে হাজির হল শাহিন। ডলার গুনতে গুনতে মালিক জিজ্ঞাসা করল, 'আবার কী হল?'

'আমাকে তো এখন পুলিশ ধরবে।' শাহিনের গলা শুকনো।

'চুরি-চামারি না মারপিট?'

'ওই দরখাস্তে আমার নাম ঠিকানা দেখে চলে আসবে এখানে।'

'এই দরখাস্ত পুলিশ দেখবে কে বলল তোমাকে?'

'আকবরভাই।'

'ডাকো তাকে।'

আকবরভাই এল। মালিক বলল, 'আমি ওকে বিপদে ফেলব এই ধারণা কেন হল?'

'আমি চার চারখানা কেস জানি, পুলিশ দরখাস্ত দেখে অ্যারেস্ট করেছে।'

চোয়াল শক্ত হল মালিকের। বলল, 'শুনলাম। ওই সব আগে হত,

যাদের গভর্নমেন্ট স্বীকৃতি দিতে চায়, তাদের টোপ দিয়ে বড়শিতে গাঁথবে কেন? ঠিক আছে কেউ ওর খোঁজ করলে বলবে ও ক্যালিফোর্নিয়ায় বেড়াতে গেছে।'

'আপনি কি অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে ওর ছবি দিয়েছেন?' আকবর জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। যেদিন ও প্রথম এখানে কাজে লেগেছিল সেদিন যে ছবি তুলে রেখেছিলাম তার দুটো অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে দিয়েছি। কেন?' মালিক চোখ ছোট করলেন।

'সেই ছবি আনলেই তো পুলিশ ওকে দেখতে পাবে।'

'হুম। আচ্ছা, তোমরা যাও, আমি খোঁজখবর নিচ্ছি।'

খবরটা রেস্টুরেন্টের সবাই জেনে গেল। রনি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'শালা পঞ্চাশ সেন্ট মাইনে বাড়াবে না উলটে বাঁশ দিল। আমরা কি বুদ্ধু! আমরা কি জানি না লটারির কথা? লটারি হচ্ছে একটা টোপ। কাগজ পাবে বলে দরখাস্ত করো, তোমার কথা পুলিশ জেনে যাবে। লাখ লাখ লোক বিনা কাগজে ঘুরছে, পুলিশ ধরতে পারছে না। টোপের কথা লোকে জেনে গেছে বলে একমাত্র বুদ্ধুরাই অ্যাপ্লাই করে।'

আকবর বলল, 'কথাটা ঠিক। এই যে মেক্সিকানরা, যাদের ছাড়া কোনও কনট্রাক্টর ঘর বাড়ি তৈরি করতে পারত না এ দেশে, তাদের তো পাসপোর্টই নেই তো ভিসা কী করে থাকবে! পুলিশ জানে কিন্তু মেক্সিকানদের ধরে না। তা হলে ঘর-বাড়ি তৈরি বন্ধ হয়ে যাবে। ধরে শুধু বাংলাদেশি আর পাকিস্তানিদের। একশোটা রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে গেলে সরকারের কোনও ক্ষতি হয় না।'

'তা হলে আমি কী করব?' শাহিন জিজ্ঞাসা করল।

'লটারির রেজাল্ট না বের হওয়া পর্যন্ত এখানে না থাকা উচিত।' রনি বলল।

'কোথায় যাব?'

সবাই গম্ভীর হয়ে থাকল। রনি চাপা গলায় বলল, 'যা মাইনে পায় তার সবটাই দেশে পাঠায়। দেশের মানুষরা বড়লোক হচ্ছে আর তোমার

যাওয়ার জায়গা নেই। অর্ধেক ডলার জমিয়ে রাখলে এখন ভাবতে হত না কোথায় যাবে!'

কিচেনআন্টি শুনছিল, এবার জিজ্ঞাসা করল, 'কতদিন বাইরে থাকতে হবে?'

'এক মাসের মতো।'

'মালিক ছাড়বে?'

শাহিন বলল, 'না ছাড়লে তো আমাকে জেলে যেতে হবে।'

'ঠিক আছে। কাল এসে বলব। চেষ্টা করছি একটা ব্যবস্থা করতে।' কিচেনআন্টি গল্পের বই পড়া শুরু করল। কাজ না থাকলে প্রৌঢ়া গল্পের বই পড়ে।

রাত বারোটায় দোকান বন্ধ হয়ে গেলে মালিক চলে গেল। কিচেনআন্টি বেরিয়েছে আজ একটু আগেই। রনি বলল, 'শাহিন, চলো একটু ঘুরে আসি!'

'এখন?'

'এখনই তো ঘোরার টাইম। ট্রেন ধরে পাঁচটা ব্লক পরে যাব। তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।'

'পুলিশ যদি ধরে?'

'রাস্তায় পুলিশ কাউকে ধরবে না। ধরলে এই রেস্টুরেন্টে এসে ধরবে।'

আকবর বলল, 'যাও, ঘুরে এসো।'

ওরা সবাই প্যাসেজ দিয়ে ফুটপাতে এসে দাঁড়াল। শাহিন আর রনি ছাড়া কারও পরনে বাইরের পোশাক নেই। দোকানপাট সব বন্ধ শুধু পাশের গ্রসারির দোকান এখনও খোলা। শাহিন জিজ্ঞাসা করল, 'এইটা বন্ধ হয় কখন?'

'বোধহয় হয় না।'

এই সময় দূরে পুলিশের গাড়িকে দেখা গেল হুটার বাজিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন প্যাসেজ দিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। রনিকে অনুসরণ করে শাহিন পাশের গ্রসারির

দোকানে ঢুকল। দোকানে তখন একজন মাত্র খদ্দের। রনি সেলসম্যানকে বলল, 'উই আর ইন প্রবলেম!' বলে হাসল।

'হোয়াট প্রবলেম?'

ততক্ষণে পুলিশের গাড়িটা রেস্টুরেন্টের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দরজা খুলে নেমে এসে একজন অফিসার চারপাশে তাকাচ্ছেন। রনি বলল, 'উই হ্যাভ নো পেপারস। পুলিশ হ্যাজ কাম।'

'দেয়ার ইজ এ প্যাসেজ ইন দি ব্যাক। টেক দ্যাট। হ্যাভ এ নাইস টাইম।' শোনামাত্র রনি পা চালাল। সঙ্গে শাহিন।

সরু অন্ধকার প্যাসেজের শেষে একটা বন্ধ দরজা। হাতল ঘুরিয়ে সেটা খুলে বাইরে আসতেই দূরে রাস্তার আলো দেখা গেল। এটা রেস্টুরেন্টের পেছনের রাস্তা। শাহিন জিজ্ঞাসা করল, 'দোকানদারটা কি চিনা?'

'দোকানদার না, সেলসম্যান। ফিলিপিনস-এর লোক। আমার সঙ্গে আলাপ ছিল বলে হেলপ করল।' হাসল রনি। ওরা হাঁটতে হাঁটতে একটু ঘুরে রেস্টুরেন্টের সামনের রাস্তায় চলে এসে দেখল পুলিশের গাড়িটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

রনি বলল, 'কোনও ডাউট নেই। ও শালা তোমার খোঁজে এসেছে।'

'কেন মনে হচ্ছে?'

'কোনওদিন আসে না, দরখাস্ত জমা পড়ল আর ও চলে এল?'

দূরে একটা বন্ধ দোকানের সামনে রাখা বোর্ডের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওরা দেখল পুলিশ অফিসার বেরিয়ে আসছে গ্রসারির দোকান থেকে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে লোকটা নিজের ঘড়ি দেখল। তারপর এগিয়ে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে উঠে বসল।

পুলিশের গাড়ি চোখের আড়ালে চলে গেলেও রনি নড়ল না। বলল, 'আরও কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে। যদি শালা ফিরে আসে!'

কিন্তু এল না। শাহিন জিজ্ঞাসা করল, 'এখন আমরা কী করব?'

ঘড়ি দেখল রনি। 'অনেক লেট হয়ে গেল। চলো, ঘরেই যাই!'

'ধরো যদি পুলিশ ফিরে আসে?'

'রেস্টুরেন্ট বন্ধ দেখে চলে গেছে। আজ আর আসবে না বলে মনে হচ্ছে। প্যাসেজের দরজা বন্ধ বলে ঢুকতে পারেনি। ওই দরজা ভাঙতে হলে সঙ্গে ওয়ারেন্ট রাখতে হয়। তুমি তো খুনি বা উগ্রপন্থী নও, তাই এত কষ্ট পুলিশ করবে না।' হাসল রনি।

অনেক ডাকাডাকির পর দরজা খুলেছিল আকবরভাই। পুলিশ চলে গিয়েছে শুনে বলেছিল, 'কাল সকালে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

সকালে যখন মূল দরজা বন্ধ রেখে রেস্টুরেন্ট পরিষ্কারের কাজ চলছে তখন ফোনটা মিহি শব্দে বাজতে লাগল। ফোনের রিং জোরে হোক তা মালিক পছন্দ করেন না।

কাউসার এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল, 'হ্যালো-ও।' তারপরেই মুখের চেহারা বদলে গেল ওর, 'ওহো কিচেনআন্টি! বলেন! হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুড মর্নিং!' কিছুক্ষণ শোনার পর সে শাহিনের দিকে তাকিয়ে ইশারায় ডাকল, 'কিচেনআন্টি!'

রিসিভার ধরিয়ে দিয়ে কাউসার শাহিনকে বলল, 'কথা বল!'

'হেলো। আমি শাহিন।'

'হ্যাঁ, কাল কোনও সমস্যা হয় নাই তো?'

'হইছিল, পুলিশ আসছিল। আমাদের কাউকে পায় নাই।'

'কী ঠিক করলা তোমরা?'

'এখনও কিছু ঠিক হয় নাই।'

'শোনো, আমার বাসার তিন ঘর পরে একটা রেস্টুরেন্ট আছে। তিনজন ওখানে কাম করে। একজন কুক, একজন হেল্‌পার আর একজন ওয়েটার। ওই ওয়েটার ছেলেটা ফ্লোরিডায় যাবে এক মাসের জন্য। আমি কাল রাতে তোমার কথা বলছিলাম। ওরা রাজি আছে। তুমি ইচ্ছা করলে আজই জয়েন করতে পারো, কিচেনআন্টি বলল।

'এক মাসের জন্য?'

'হ্যাঁ। তারপর ওই ওয়েটার ফিরে আসবে।'

'তারপর আমি কোথায় যাব?'

'কেন? তুমি ওখান থেকে একমাসের জন্যে ছুটি চাও।' কিচেনআন্টি

বলল, 'তুমি রাজি হয়ে যাও। না হলে সমস্যা হবে। আমি ডিউটিতে যাওয়ার সময় মিসেস প্লাটিনিকে বলে যাব। বাই।'

আকবরভাইকে ফোনের কথা বলল শাহিন। আকবরভাই বলল, 'এর চেয়ে ভাল কথা আর কী হতে পারে! তবে পুলিশ দু'-তিনবার হয়তো এখানে আসবে, তারপর তোমার কথা ভুলে যাবে। দশ দিনের ছুটি নিলেও সমস্যা থাকবে না।'

মালিকও প্রথমে তাই বলেছিল, 'এক মাসের ছুটি? ইয়ারকি নাকি? ওই এক মাস রেস্টুরেন্টের তোমার কাজ কি অন্যরা করে দেবে? আমাকে লোক রাখতে হবে। এক মাস পরে তাকে ছাড়াব কী করে? দশ দিন হলে তবু ম্যানেজ করা যায়। কত মাইনে পাবে ওখানে?'

'জানি না।'

'দ্যাখো, কত ধানে কত চাল হয়। আট ঘণ্টা কাজ করে ষোলো ডলার পাবে না। ঠিক আছে যাও, গিয়ে কথা বলো।' মালিক অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়েছিলেন।

কিচেনআন্টি ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ওই রেস্টুরেন্টে যেতে হলে ট্রেন থেকে কোথায় নামতে হবে, কতটা হাঁটতে হবে। আকবরভাই শাহিনকে জোর করে লাঞ্চ খাইয়ে দিল। কাউসার একটা কাগজে রেস্টুরেন্টের নাম-ঠিকানা ফোন নাম্বার লিখে দিল। রনি বলল, 'লাগেজ না নিয়ে খালি হাতে যাও। কথা বলে ভাল লাগলে ফোন করবে, লাগেজ পৌঁছে দেব।'

বেরোবার সময় কষ্ট হচ্ছিল শাহিনের। যেন নিজের বাড়ি থেকে চলে যেতে হচ্ছে এইরকম অনুভূতি হচ্ছিল। রেস্টুরেন্ট থেকে ডান দিকে কিছুটা হাঁটলে পাতাল রেল ধরার জন্যে সিঁড়ি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে আসার পর কোনওদিন ওই সিঁড়ি দিয়ে নামেনি সে। নীচে নেমে টিকিট কাউন্টারের দিকে এগোতেই থমকে দাঁড়াল শাহিন। একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা তার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। কী করবে সে এখন? দৌড়ে ওপরে উঠে যাবে? কিন্তু পুলিশের হাত এড়িয়ে কি সে বাঁচতে পারবে? কুলকুল করে ঘাম বেরিয়ে এল সমস্ত শরীর থেকে। পুলিশটা যখন তার পাশ দিয়ে ওপরে চলে গেল

তখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। আরও কয়েক সেকেন্ড যাওয়ার পর রুমালে মুখ মুছল শাহিন।

মাটির নীচ দিয়ে ট্রেন ছুটল। ফাঁকা ট্রেন। জানলার পাশে বসে স্টেশন না এলে কিছুই দেখা যায় না। শাহিনের চোখ পড়ল উলটোদিকে বসা একজন মহিলার ওপর। একমনে বই পড়ছেন। মহিলার পরনে জামদানি শাড়ি। শাড়িটা যে জামদানি তা সে অনুমান করেছে। ওর গ্রামের একটা মেয়ের ঢাকায় বিয়ে হয়েছিল। শ্বশুরবাড়ি থেকে এইরকম শাড়ি পরে সে গ্রামে এসেছিল। বলেছিল, 'খুব দামি জামদানি, আমার জামাই দিয়েছে।' বাংলাদেশের বেশিরভাগ মেয়ে হাজব্যান্ডকে জামাই বলেন, এই মহিলাও নিশ্চয়ই বাংলাদেশি। কিন্তু কী নির্ভয়ে নিউইয়র্কের পাতাল রেলে বসে বই পড়ে চলেছেন।

ঠিক এগারোটা স্টেশন চলে গেলে উঠে দাঁড়াল শাহিন। প্ল্যাটফর্মে নেমে স্টেশনটার নাম মিলিয়ে নিয়ে ওপরে উঠে এল। জায়গাটা অদ্ভুত। যে অঞ্চলে সে এতদিন ছিল তার সঙ্গে কোনও মিল নেই। ফাঁকা ফাঁকা, বাড়িগুলোও তিনতলার বেশি উঁচু নয়। রাস্তায় মানুষ তেমন নেই, গাড়িরও সংখ্যা খুব কম। কিচেনআন্টি যেমন বলেছিল তেমনই হেঁটে যাচ্ছিল সে। হঠাৎ চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়াল শাহিন। একটা ছেলে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে, আর তার পেছনে একটা বিশাল চেহারার লোক ছুরি হাতে ছুটছে। দু'জনেই কালো। ওরা তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে অন্য গলিতে ঢুকে গেল। লোকটা নিশ্চয়ই ছেলেটাকে খুন করবে। এই ভরদুপুরে ঘটনাটা ঘটবে, কিন্তু কেউ সাক্ষী থাকবে না!

হঠাৎ ঝাঁ-চকচকে কয়েকটা দোকান দেখতে পেল শাহিন। গ্রসারি শপ, সেলুন, ফটোর দোকানের পাশে 'ইন্ডিয়ান ডিশেস' লেখা সাইনবোর্ড। এই রেস্টুরেন্টের কথাই বলেছে কিচেনআন্টি।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই আধা-অন্ধকারে যা চোখে পড়ল তাতে শাহিন বুঝল গোটা দশেক টেবিল রয়েছে। এখন কোনও কাস্টমার নেই। একটা সিড়িঙ্গে চেহারার লোক এগিয়ে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই?'

'মিসেস প্লাটিনি—।'

'উনি এখন বিশ্রাম করছেন। কোত্থেকে আসছ? কী দরকার?'

কিচেনআন্টির কথা বলতে গিয়ে থমকে গেল শাহিন। সবাই ওকে কিচেনআন্টি বলে, ওর আসল নামটা কেউ উচ্চারণ করে না। তবু সে গম্ভীর গলায় বলল, 'কিচেনআন্টি!'

'কিচেনআন্টি? এটা একটা নাম?' লোকটা অবাক হল।

'এই রেস্টুরেন্ট যাঁর, তিনি আমাকে দেখা করতে বলেছেন। তাঁর বিশ্রাম নেওয়া শেষ হয়ে গেলে দয়া করে খবরটা দিয়ো। আমার নাম শাহিন।' পাশের চেয়ারে বসে পড়ল সে।

'শাহিন!' বলে লোকটা চলে গেল ভেতরের দিকে।

মিনিট পাঁচেক পরে রেস্টুরেন্টটাকে কাঁপিয়ে বেল বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সিড়িঙ্গে লোকটা ছুটে এসে শাহিনের পেছনের দরজায় টোকা মারল, মেরে সন্তর্পণে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। কিন্তু বেরিয়ে এল পরমুহূর্তে, 'যাও, তোমাকে ডাকছে।'

শাহিন অবাক হল। খবর না দেওয়া সত্ত্বেও মিসেস প্লাটিনি জানলেন কী করে? দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই নীল আলোয় ভেসে থাকা ছোট্ট ঘরটায় চোখ ঘোরাল সে। ঘরের এক প্রান্তে লম্বা ইজিচেয়ারের হাতলে দু'পা ছড়িয়ে যে মহিলা আধশোয়া হয়ে আছেন তাঁর বয়স আন্দাজ করা কঠিন। কিন্তু তাঁর শরীর বেশ মোটাসোটা এবং মুখে সাদা রঙের মোটা প্রলেপ থাকায় শুধু লাল ঠোঁট আর চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে।

'কখন এসেছ?' ইংরেজিতে প্রশ্ন। শরীর যেমন ছিল তেমন রেখে।

'পাঁচ মিনিট আগে।'

'এই পাঁচ মিনিট কী করছিলে?'

'বসে ছিলাম।'

'আমার এখানে আমি কাউকে বসে থাকার জন্যে কাজ দিই না।'

'আমি খবর দিতে বলেছিলাম, শুনলাম আপনি বিশ্রাম করছেন।'

'ওঃ! মাতব্বর, মাতব্বরে ভরে গেছে পৃথিবীটা। নাম কী?'

'শাহিন।'

'বাংলাদেশি?'

'হ্যাঁ।'

‘কদ্দিন রেস্টুরেন্টের কাজ করেছ?’

‘প্রায় দু’বছর।’

‘হুঁ! একা এই রেস্টুরেন্ট সামলাতে পারবে? রাত সাড়ে ন’টা থেকে আড়াইটে পর্যন্ত খুব ভিড় থাকে শুক্র এবং শনিবার। অন্য রাত্রে কাজ হালকা।’

‘চেষ্টা করব। দশটা টেবিল দেখলাম। তার মানে ঘণ্টায় প্রত্যেক টেবিলকে ছ’মিনিটের বেশি দিতে পারব না।’ শাহিন বলল।

‘তা হলে আমার ব্যাবসা ডকে উঠবে। দু’ঘন্টায় তিন ব্যাচ চাই। তার মানে তিরিশটা। পার টেবিলে চার মিনিট।’

‘অসম্ভব!’

‘ঠিক আছে, শুধু শনিবারের রাত্রে আমি জুলিকে ডেকে নেব। কিন্তু জুলি খুব গায়ে পড়া মেয়ে। মেয়েমানুষ দেখলেই জিভে জল আসে নাকি?’

‘না।’

‘গুড। কাছে এসো।’ হাত বাড়াল মহিলা।

দু’পা এগোল শাহিন। মহিলা গলা নামালেন, ‘আমি পার আওয়ার তোমাকে আট ডলার দিতে পারি যদি তোমার কাছে ওয়ার্কিং পারমিট থাকে। কিন্তু আমি চাইব সেটা যেন না থাকে।’

‘না নেই।’

‘গুড। তা হলে তুমি আজ কাজে লেগে যাও। তোমার কাজ দেখে কাল বলব কত দিতে পারব। হ্যাঁ, কাজে লাগার আগে কয়েকটা কথা মন দিয়ে শোনো। এই রেস্টুরেন্ট আমার। এখানে আমিই শেষ কথা। আমার বিরুদ্ধে কাউকে কিছু বলতে শুনলে সেটা আমাকে জানিয়ে দেবে। কোনও কাস্টমার যদি মাস্তানি করতে চায়, তা হলে তুমি তার সঙ্গে টক্কর দেবে না। বিনীতভাবে বলবে, সে ঠিক বলছে। কিন্তু প্রথম সুযোগেই আমাকে এসে তার কথা জানিয়ে দেবে। বকশিশ যা পাবে তা কাউন্টারের এক পাশে রাখা বাক্সে ফেলে দেবে। কারণ যে ঠিকা কাজ করছে অথবা হেল্প করছে তারও বকশিশ পাওয়া উচিত। রেস্টুরেন্ট বন্ধ হওয়ার পর সেই ভাগটা আমি করে দেব। আন্ডারস্ট্যান্ড?’

মাথা নাড়ল শাহিন। কিন্তু সে মহিলার দিকে তাকাতে পারছিল না। ওঁর পরনে একটা লাল রঙের সিল্কের পোশাক যা হাঁটুর নীচে শেষ হয়েছে। ওপরের দিকটা থেকে দুটো লাল ফিতে উঠে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে। কিন্তু বুকের সামনেটা এতই উন্মুক্ত যে দৃশ্যটা দেখতে অস্বস্তি হচ্ছিল শাহিনের।

বেল বাজালেন মহিলা। তৎক্ষণাৎ সিড়িঙ্গে লোকটি উঁকি মারল। মহিলা বললেন, 'এর নাম লুকা। হেড কুক। ওর হেলপার হল আলি। আমার লোকটি আজ থেকে ছুটিতে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম জুলিকে বলব রাত্রে আসতে, দিনে রেস্টুরেন্ট বন্ধ রাখব। ওকে। লুকা, শাহিনকে ইউনিফর্ম বের করে দাও।'

'ওকে ম্যাম!' লুকা বলল।

কিচেনের পাশে এক চিলতে ঘরে নিয়ে গিয়ে লুকা তাকে ইউনিফর্ম বের করে দিল। দেখা গেল ওটা শাহিনকে চমৎকার মানিয়েছে। মেনুকার্ড ভাল করে বুঝিয়ে দিল লুকা। এদের কাবাব খুব জনপ্রিয়। ঝাল বা ঝোল না থাকায় কাস্টমাররা কাবাব খুব পছন্দ করে। চার রকমের কাবাব ছাড়া গোরু এবং চিকেনের কয়েকটা পদ আছে। লুকা বলল, 'তোমাকে দেখে খারাপ লাগছে না। যদি ভাল কাজ করতে পারো তা হলে তোমার কপাল খুলে যেতে পারে।'

'কীভাবে?'

'যার জায়গায় কাজ করতে এসেছ তাকে ম্যাম একদম পছন্দ করেন না। কিন্তু লোকটা এত এফিশিয়েন্ট যে সহ্য করত।' লুকা অদ্ভুত হাসল।

রেস্টুরেন্ট ঘুরে দেখল সে। ছেলে এবং মেয়েদের টয়লেট আলাদা এবং বেশ অযত্নের ছাপ সেখানে। লুকাকে ব্যাপারটা জানাল শাহিন। কাল সকালে সুইপার এলে তাকে সতর্ক করে দেবে বলে জানাল লুকা।

আটটা বাজলে ইউনিফর্ম পরে আয়নার সামনে দাঁড়াল শাহিন। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। রেস্টুরেন্টে এখন কোনও খদ্দের নেই। দরজার বাইরে পাবলিক টেলিফোন রয়েছে। সেখানে গিয়ে কয়েন ফেলল সে কাউসারের দেওয়া কাগজ দেখে।

রিং হচ্ছে। তারপর চেনা গলা কানে এল। এই গলা মালিকের নয়।

'হ্যালো! আমি শাহিন।'

'আরে! এতক্ষণ ফোন করতে কী অসুবিধা হয়েছিল? কাজ হল?'

'হ্যাঁ, জয়েন করেছি। মালিক কোথায়?'

রনি বলল, 'রেস্টুরেন্টের বাইরে। পুলিশকে সি-অফ করছে।'

'পুলিশ?'

'তোমার খোঁজে এসেছিল। মালিক বলল, ওই নামের কেউ এখানে নেই। আমাদের লাইনে দাঁড় করিয়ে ছবির সঙ্গে পরখ করল।' শব্দ করে বলল রনি।

'তোমাদের কাছে কাগজ চায়নি?'

'না। তোমাকে টার্গেট করেছে। অন্য দিকে তাকাবে না।'

'তারপর?'

'মনে হচ্ছে আর আসবে না।' রনি বলল, 'রাখছি, মালিক আসছে।'

ঠিক ন'টায় মালকিন এসে কাউন্টারের ভেতরে ঢুকলেন। অবাক হয়ে তাঁকে দেখল শাহিন। দামি গাউন পরনে, চুলে অনেক কায়দা, গলায় গহনা দিয়ে বুকের ভাঁজ ঢাকার মৃদু চেষ্টা, মুখে রঙের রংছবি। কিছুদিন আগে ছুটির রাত্রে পাশের হলে নাইট শো দেখতে গিয়েছিল সে, সেখানে আফ্রিকার জঙ্গলে আদিবাসীদের রানিকে যেমন দেখেছিল, এখন মালকিনকে ঠিক তেমনই দেখাচ্ছে। মালকিন হাততালি দিলেন, 'নাউ রেডি, এভরিবডি গেট রেডি।' তারপরই হাত বাড়িয়ে দিলেন মিউজিক সিস্টেমের দিকে। গমগম করে বাজতে লাগল ইংরেজি গান।

প্রথম খদ্দের ঢুকল একটু পরেই। বেশ লম্বা চওড়া, হাতে উল্কি আঁকা, গেঞ্জি আর জিনস পরা লোকটি কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'হাই বেবি।'

মালকিন কাঁধ নাচালেন, 'হাই।'

'নিড সাম মানি। রাইট নাউ!'

'কোত্থেকে দেব? এক পয়সা বিক্রি হয়নি।'

'তুমি গত সপ্তাহে কিছুই দাওনি।'

'কে বলল দিইনি! তোমার বাবাকে দিয়েছি।'

'তার মানে?' লোকটা হুংকার দিল।

'আমার ব্যাবসা নষ্ট কোরো না বব।' কড়া গলায় বললেন মালকিন।

সঙ্গে সঙ্গে গলা নামাল লোকটা, 'কাম অন বেবি! একশোটা ডলার দাও। তা হলেই আমার চলে যাবে।'

বাঁ হাত দিয়ে ক্যাশবাক্স থেকে কুড়িটা ডলার বের করে ছুড়ে দিয়ে মালকিন বললেন, 'নাউ গেট লস্ট।'

নোটটা তুলে নিয়ে লোকটা মুখ ঘুরিয়ে শাহিনকে দেখতে পেয়ে বলল 'হু ইজ হি? নতুন মনে হচ্ছে?' তারপর খিক খিক করে হেসে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। এইরকম ঝামেলা আগের রেস্টুরেন্টে কোনওদিন হয়েছে বলে মনে পড়ছে না শাহিনের।

লুকা জানাল এই পাড়ায় এরকম মাস্তান জনা আষ্টেক আছে। প্রতি সপ্তাহে ম্যাম তাদের কুড়ি ডলার করে দিয়ে থাকেন। রেস্টুরেন্টে কোনও উটকো খদ্দের ঝামেলা বাধালে ওরাই তার দায়িত্ব নিয়ে নেয়। তা ছাড়া এই এলাকার সবচেয়ে বড় নেতা নাকি এককালে ম্যামের প্রেমিক ছিলেন। ম্যাম তাঁকে একটা ফোন করলে ঝামেলাবাজদের পরদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আজ একাই সামলে নিল শাহিন। আলি তাকে সাহায্য করায় চরকির মতো পাক খেয়ে দশটা টেবিলের খদ্দেরদের খুশি করল সে। খদ্দেরদের চেহারা দেখেই বুঝতে পারছিল যে ওরা কেউ অভিজাত নয়। বাংলাদেশি বা ইন্ডিয়ানরা এখানে আসেনি, বেশিরভাগই হিসপ্যানিস অথবা কালো। তাদের কথাবার্তা-হাঁটাচলা রীতিমতো ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো। কিন্তু লুকা বলেছিল, 'কোনও ভয় নেই। ম্যাম তোমার মালকিন, তোমার আবার ভয় কীসের!'

রাত বারোটায় সে সমস্যায় পড়ল। তিনটে কালো ছেলে একটা সাদা মেয়েকে নিয়ে খেতে এসেছিল ঘণ্টা আড়াই আগে। দুটো চিকেন কাবাব নিয়ে মদ গিলছিল সমানে। মেয়েটার নেশা হয়ে গিয়েছিল খুব। সে যখন

টলতে টলতে টয়লেটে গিয়েছিল, তখন ছেলে তিনটে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বলেছিল, 'হে ম্যান, দামটা ওর কাছ থেকে নিয়ে নিয়ো।' বলে দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিল তারা। মেয়েটা ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসেই মাথা নামিয়ে ফেলেছিল টেবিলে। শাহিন তার কাছে গিয়ে খুব বিনীত গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমাদের রেস্টুরেন্টের সময় শেষ। বিল নিয়ে আসব?'

মেয়েটা কোনওমতে মুখ তুলে তাকিয়েছিল, 'হু আর ইউ?'

'ওয়েটার।'

'ওরা কোথায়?'

'চলে গেছে। বলেছে আপনি পেমেন্ট করবেন।'

'আমি?' হাসল মেয়েটা, 'দে আর চিট। হু আর ইউ?'

'ওয়েটার।'

'দেন ওয়েট প্লিজ।'

রেস্টুরেন্ট তখন ফাঁকা। শাহিন কাউন্টারের সামনে গেল। মালকিন তখন সব গুছিয়ে ফেলছেন। সমস্যাটা তাঁকে জানাল সে। মালকিন ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটাকে দেখলেন। তারপর হাসল, 'তুমি ওদের খাবার, ড্রিঙ্কস সার্ভ করেছ, দাম আদায় করার দায়িত্বও তোমার।'

'কিন্তু উনি তো মাতাল হয়ে গিয়েছেন।'

'সেটা তোমার সমস্যা।' মালকিন বললেন, 'নেশা হচ্ছে দেখে আগে আমায় বলোনি কেন? বাইরে রাস্তার মোড়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ডেকে নিয়ে এসো।'

এইসময় একটা লোক দরজা ঠেলে উঁকি মারল, 'ভেতরে আসতে পারি?'

'নো! রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' মালকিন বাজখাঁই গলায় বললেন।

'আমি খেতে আসিনি, নিয়ে যেতে এসেছি।'

'এখন কোনও খাবার ডেলিভারি দেওয়া যাবে না মিস্টার।'

'না না। খাবার না। আমার ওয়াইফকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কাম ইনসাইড।'

লোকটা ভেতরে ঢুকল। রোগা খাটো, স্বাভাবিক চেহারার কালো

মানুষ। মালকিন শূন্য রেস্টুরেন্টে একা বসে থাকা মেয়েটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার ওয়াইফ?'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

মালকিন শাহিনকে বললেন, 'ওঁকে বিলটা দাও।'

শাহিন চটজলদি বিল সমেত প্লেট এগিয়ে ধরতেই লোকটি কাগজটা তুলে নিয়ে দেখল। মুখটা একটু করুণ হল কিন্তু পরক্ষণেই সেটা সামলে নিয়ে পকেট থেকে পার্স বের করে পেমেন্ট করে দিয়ে এগিয়ে গেল মেয়েটার কাছে, নিচু গলায় বলল, 'চলো, বাড়ি চলো।'

'কে?'

'আমি।'

'ও। বাট হি ইজ ওয়েটিং। ওয়েটার।'

'ইটস অলরাইট। লেটস গো।'

স্বামীর শরীরে ভর রেখে মহিলা চলে গেল বাইরে।

লুকা এবং আলি দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল ব্যাপারটা। লুকা বলল, 'ইউ আর লাকি শাহিন।' আলি আলোগুলো নেভাচ্ছিল। মালকিন বাইরে চলে গেলে লুকা রেস্টুরেন্টের দরজায় তালা ঝোলাতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে অপেক্ষা করতে বলল শাহিন। তারপর মালকিনের সামনে গিয়ে বলল, 'আমার তো রাত্রে থাকার জায়গা নেই। আগে যে রেস্টুরেন্টে কাজ করতাম আমরা সেখানেই থেকে যেতাম।'

'এটা তোমার সমস্যা।'

'আমার তো কাগজ নেই। তাই—!'

মালকিন বলল, 'লুকা, তোমার ওখানে ওর থাকার ব্যবস্থা কি হতে পারে?'

'না ম্যাম। একটা ঘরে দুই ব্যাচে পাঁচজন করে দশজন থাকি।' লুকা বলল।

'কিন্তু তুমি তো লাগেজ নিয়ে আসোনি। এক জামা-কাপড়ে চিরকাল থাকবে নাকি! আরে! তুমি তো এখনও ইউনিফর্ম পরে আছ! কাজ শেষ হয়ে গেলে খুলে রাখোনি কেন?'

'সময় পাইনি। ওই মেয়েটার জন্যে—! ঠিক আছে, আমি ভেতরে

গিয়ে চেঞ্জ করে আসছি। ওই রেস্টুরেন্টের একটা ছেলে বলেছিল আমার ব্যাগ এখানে পৌঁছে দিয়ে যাবে। কেন যে এল না কে জানে!' চিন্তিত গলায় বলল শাহিন।

'যাও, চেঞ্জ করে এসো।'

ইউনিফর্ম খুলে নিজের জামা-প্যান্ট পরে আলো নিভিয়ে বেরিয়ে আসতেই লুকা তালাগুলো লাগিয়ে দিয়ে 'গুডনাইট ম্যাম' বলে আলিকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগল বাঁ দিকের ফুটপাত ধরে। শাহিন জিজ্ঞাসা করল, 'আলি কোথায় থাকে?'

'লুকার সঙ্গে। অনেকদিন ধরে আছে। মেড ফর ইচ আদার।'

'মানে?'

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল মালকিন। আজ সারাদিনে এই প্রথম মহিলাকে এভাবে হাসতে দেখল শাহিন। 'ওদের কোনও মহিলাকে প্রয়োজন হয় না। তুমি এখন কী করবে।'

'আমি আগের রেস্টুরেন্টে গিয়ে দেখি—।'

'ওখানে নাকি পুলিশের সঙ্গে তোমার কিছু সমস্যা হয়েছে!'

'হ্যাঁ। ওই রেস্টুরেন্টের মালিক আমাকে দিয়ে লটারিতে গ্রিন কার্ড পাওয়ার জন্যে দরখাস্ত করিয়েছিল। তারপর থেকে পুলিশ আমাকে খুঁজছে।'

'ওখানকার ফোন নাম্বার কী?'

কাউসারের দেওয়া কাগজটা এগিয়ে দিল শাহিন। সেল ফোনে ডায়াল করলেন মালকিন। তারপর এগিয়ে দিলেন শাহিনকে। মালিকের গলা কানে এল। সে বলল, 'আমি শাহিন। রনি আছে?'

'রনি? না থাকলেই ভাল হত। ওপরে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে শুয়ে আছে। ইতরামি করতে গিয়েছিল একটা মেয়ের সঙ্গে। তার দুই বন্ধু ওর মুখ ফুলিয়ে দিয়েছে। পুলিশে ডায়েরি করলে ওকেই ধরে নিয়ে যাবে বলে করিনি। তোমার কী চাই?'

'আমার সুটকেস—!'

'নিয়ে যাওনি! ওঃ। ঠিক আছে, কাল পাঠিয়ে দেব।' লাইন কেটে দিল মালিক।

'ওখানে যাওয়া যাবে না?' সেলফোন নিয়ে নিলেন মালকিন।

'না।' অর্ধসত্য বলল শাহিন।

'চলো। আজকের রাতটা আমার ওখানে থেকে যাও। কাল দেখা যাবে।' মালকিনকে অনুসরণ করল শাহিন নির্জন ফুটপাতে। মহিলা যদি ছয় ইঞ্চি ছোট হতেন তা হলে কুমড়োর মতো দেখতে হতেন। এত মোটা, চওড়া শরীর অথচ লম্বা বলে খুব কুৎসিত দেখাচ্ছে না। নিতম্ব প্রবলভাবে ওঠা নামা করছে পদক্ষেপের সঙ্গে।

হাঁটতে হাঁটতে মালকিন জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু খেয়েছ?'

'না। সময় পাইনি।'

'গুড। রেস্টুরেন্টে চাকরি করা মানে খাবারের ওপর রাইট তৈরি হয়ে যায় না। তা হলে ট্যাকশালে যারা কাজ করে তারা পকেট ভরতি করে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারত। তুমি তো বাংলাদেশের মানুষ। সেখানে কত লোক দিনে দু'বেলা খেতে পায় না?'

'খুব কম লোক।'

'তাই নাকি? তা হলে তো বলতে হবে তোমাদের দেশের লোক বেশ বড়লোক। তা হলে ডলার রোজগারের ধান্দায় কাগজপত্র ছাড়া এদেশে এসেছ কেন?'

উত্তর দিল না শাহিন। বাংলাদেশের বিরূপ সমালোচনা করলে তার খুব রাগ হয়। যতই গরিব হোক, বাংলাদেশ তার জন্মভূমি, মা।

দুটো ব্লক পেরিয়ে এসে একটা একতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে চাবি বের করে সিঁড়ি ভেঙে প্রধান দরজার তালা খুললেন মালকিন। শাহিন ঢোকামাত্র দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। একটা ঘেরা জায়গা। এবার দ্বিতীয় চাবি দিয়ে দু'নম্বর দরজা খুলতেই দুটো লিফট দেখতে পেল সে। কোনও সিঁড়ি নেই। লিফটের পাশে একটা ডায়াল বক্স। তাতে কয়েকটা নাম্বার টিপতেই একটা লিফটের দরজা খুলে গেল। মালকিন বললেন, 'চলে এসো।'

লিফটে উঠে নাম্বার দেখছিল শাহিন। সোজা আট নম্বরে গিয়ে লিফট থামল। দরজা খুলে গেল। ওরা বেরোতেই সেটা বন্ধ হয়ে নীচে নেমে গেল। এই ফ্লোরে সম্ভবত তিনটে ফ্ল্যাট, দরজা তিনটে। বাঁ দিকেরটার

গর্তে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে মালকিন বললেন, 'এই হল আমার ফ্ল্যাট। খবরদার নোংরা করবে না, নোংরামি আমি সহ্য করতে পারি না। বোসো ওখানে।' মালকিন পরদা সরিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। এখন ঘড়িতে রাত একটা বাজতে দশ।

সোফায় বসল শাহিন। মেঝে কার্পেটে ঢাকা। এরকম একটা ঘরের কথা ফরিদপুরের গ্রামে কেউ কল্পনাও করতে পারত না। এখানে সে স্বচ্ছন্দে ঘুমাতে পারে। আবার ঘড়ির দিকে তাকাল শাহিন। এখন গ্রামে কেউ জেগে নেই। আব্বু বা আম্মু নিশ্চয়ই ঘুমে কাদা হয়ে আছে। তারপরেই খেয়াল হল। এখন তো দেশের ঘড়িতে প্রায় দুপুরবেলা। তাদের বাড়িতে ফোন নেই। গতমাসে সে লিখেছিল ফোন নেওয়ার কথা। কিছু না হোক গ্রামীণ ফোন কিনে রাখতে পারে। আব্বু কিছুতেই সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলবে না।

ঘড়ির কাঁটা যখন দেড়টা তখনও মালকিনের কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। এতক্ষণ আরামে বসে থাকায় চাপা পড়ে থাকা খিদে চাগিয়ে উঠল। শেষবার সে খেয়েছিল আগের রেস্টুরেন্ট থেকে চলে আসার আগে।

'শা-হি-ন!' মালকিনের গলা ভেসে এল ভেতরের ঘর থেকে।

'ইয়েস ম্যাম!' সোজা হয়ে বসল শাহিন।

'কাম হিয়ার!'

পরদা সরিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকল শাহিন। বিছানার একপাশে শোওয়া-বসার মাঝখানের ভঙ্গিতে রয়েছেন মালকিন। তাঁর পোশাকও বদলে গেছে। এখন আরও সংক্ষিপ্ত।

'তোমার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে?' একটা বড় স্যান্ডউইচে কামড় দিলেন তিনি।

'ঠিক আছে।'

'ওঃ, সত্যি কথা বলতে পারো না কেন তোমরা? ওই বাথরুমে যাও। স্নান করে ফ্রেশ হয়ে নাও। কিচেনে গিয়ে দেখবে ওভেনে হ্যাম স্যান্ডউইচ রাখা আছে। খেয়ে নাও।'

চুপচাপ বাথরুমে ঢুকে গেল শাহিন। আলো জ্বালল। আয়নার নীচে তার চোখ পড়তেই সে অবাক হল। নানান রকমের সাবান, পারফিউম,

শ্যাম্পুর শিশি সাজানো। দরজা বন্ধ করে জামাপ্যান্ট ছেড়ে স্নান করে নিল সে। নরম তোয়ালে দিয়ে শরীর মোছার পর মনে হল এখন কাচা জামাপ্যান্ট পরতে পারলে ভাল লাগত।

বাইরে বেরিয়ে এসে সে দেখল মালকিন খেয়ে চলেছেন এবং এখন তাঁর হাতে ওয়াইনের গ্লাস। 'আমি কি বাইরের ঘরের সোফায় শুয়ে পড়ব?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'খাবে না?'

'ম্যাম, আমি হ্যাম খাই না। আমাদের ধর্মে নিষেধ আছে।'

'ওঃ, তাই? দেন টেক ব্রেড অ্যান্ড বাটার। ওকে?'

কিচেনে ঢুকে পাউরুটি বের করে মাখন মাখিয়ে নিয়ে চার পিস খেয়ে ঢক ঢক করে জল গিলতেই মনে হল পেট ভরে গেছে।

'ইউ লাইক ওয়াইন?'

'নো ম্যাম। থ্যাঙ্ক ইউ!'

'স্কচ? টেক ওয়ান, তোমার ভাল লাগবে।'

ফরিদপুরের গ্রামে মদ খাওয়ার কথা ভাবাই যেত না। নিউইয়র্কে আসার পর রনির পাল্লায় পড়ে রাত দুপুরে কয়েকবার এক পেগ হুইস্কি খেয়ে দেখেছে। তার ভাল লাগেনি। অথচ ওই হুইস্কি লোকে রেস্টুরেন্টে এসে চার ডলার দিয়ে কিনে খায় হাসিমুখ করে। তবে সে দেখেছিল, হুইস্কি খাওয়ার পর চটপট ঘুম এসে গিয়েছিল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে মালকিন হাসলেন। 'বুঝেছি। ওই ওখানে যাও। গ্লাসে ঢেলে নাও বোতল থেকে। পাশের আইসবক্স থেকে আইস নিয়ে নাও।'

আদেশ মান্য করল শাহিন। রনি তাকে যে কয়বার খাইয়ে ছিল গ্লাস ভরতি করে জল দিয়েছিল। এখন অর্ধেকটা বরফ নিয়েও মনে হচ্ছিল হুইস্কিটা গুলে যায়নি।

'ওই চেয়ারে বসবে। খবরদার বিছানার কাছে আসবে না।' বলেই হাসলেন মালকিন।

দূরের চেয়ারে বসে গ্লাসের দিকে তাকাতেই সে শুনতে পেল মালকিন বলছেন, 'চিয়ার্স।'

সে নিচু স্বরে 'চিয়ার্স' বলে আলতো চুমুক দিল। ঠান্ডা কিন্তু মোলায়েম পানীয় মুখে যেতেই শরীর গরম হল। রনি যা খাইয়েছিল তা গলা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। গন্ধটাও ছিল তীব্র। এই পানীয়তে সেসব কিছু বোধ হচ্ছে না।

'কেমন লাগল?'

'ভাল ম্যাম।'

'আঃ। ডোন্ট কল মি ম্যাম। অন্তত রেস্টুরেন্টের বাইরে বেরিয়ে বলবে না। আমার নাম সারা প্লাটিনি। কল মি সারা।'

মাথা নাড়ল শাহিন।

'দ্যাখো শাহিন', মালকিন শরীরটা আর একটু সুবিধেজনক ভঙ্গিতে নিয়ে যেতেই তাঁর বুক দুলে উঠল। চোখ্ সরিয়ে নিল শাহিন।

'তোমার সমস্যা নিয়ে ভাবছিলাম। লটারিতে নাম ওঠা অসম্ভব ব্যাপার। অথচ তোমাকে এই সুন্দর চেহারা নিয়েও চোরের মতো লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। ভাবতে ভাবতে আমার মাথায় একটা আইডিয়া এল। এটা ক্লিক করলে ছ'মাসের মধ্যে তুমি আমেরিকান পাসপোর্ট পেয়ে যেতে পারো।' হেসে গ্লাস শেষ করে আবার গ্লাস ভরে নিলেন মালকিন।

'কী করে?' দ্বিতীয়বার চুমুক দিল শাহিন। বেশ ভাল লাগছে।

'বিয়ে করে!'

'বিয়ে?' হকচকিয়ে গেল শাহিন। শক্ত হাতে গ্লাস ধরল।

'ওয়েল, বিয়েই বলতে পারো। আমাদের এই বাড়িতেই এক মহিলা থাকেন। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, ভাল ছেলে পেলে বিয়ে করতে পারেন। তাঁর পছন্দ এশিয়ান ছেলে।'

'কিন্তু—!' ঢোঁক গিলল শাহিন।

'কোনও আমেরিকান বয়স্কা মহিলা তোমাকে এমনি এমনি বিয়ে করবে নাকি? দেখি, ওঁর কোনও টার্মস আছে নাকি। শেষ করো গ্লাস, আমার ঘুম পাচ্ছে।'

বরফ তখনও গলেনি, অনেকটা গলায় ঢালল শাহিন তবু শেষ হল না। মালকিন বলল, 'তোমাকে আজ রাত্রে আমি খুব ঝুঁকি নিয়ে

থাকতে দিয়েছি। আমার ভাই দিয়াগো প্রচণ্ড রাগী। আমার এখানে কেউ রাত্রে থাকুক সে পছন্দ করে না। সে এখন বস্টনে বলে তোমাকে নিয়ে এলাম এখানে। আর এমনই ব্যাড লাক যে একটু আগে শরীরটা বিট্রে করল। এই সময় আমার খুব পেন হয়।' হাসলেন মালকিন, 'যাও, শুয়ে পড়ো।'

তলানিটা গলায় ঢেলে বাইরের ঘরে চলে এল শাহিন। মালকিনের শেষ কথাগুলোর অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হল না। তা নিয়ে ভাবার আগেই ঘুম এসে গেল তার।

পরদিন দুপুরে আকবরভাই এসে সুটকেস দিয়ে গেল। তখনও রেস্টুরেন্ট চালু হয়নি। সব দেখে শুনে আকবরভাই জিজ্ঞাসা করল, 'ওয়েটার ক'জন?'

'আমি একা।'

'সর্বনাশ। মরে যাবে তো! মালিক বলছিল ব্রুকলিনের একটা গ্রসারি শপে তোমার জন্যে কাজ ঠিক করে দেবে!'

'গ্রসারি শপে?' শাহিন ধন্দে পড়ল।

'বারো ঘণ্টা কাজ। থাকতে দেবে। খেতে হবে বাইরে।'

'কত টাকা দেবে?'

'মালিককে ফোন করো, বলে দেবে।'

'রনি কেমন আছে?'

'এখনও দিন চারেক শুয়ে থাকতে হবে।'

'কেন মার খেল ও?'

'দোষ ওর। কাস্টমার হাসলে তুমি হাসবে কেন? মেয়েটা নাকি এর আগেও এসে ওর দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। এদিনও কয়েকবার হাসাহাসি হওয়ার পরে ওরা যখন বেরিয়ে গেল তখন রনি প্যাসেজ দিয়ে বাইরে যায়। মেয়েটাকে ইশারা করে টেলিফোন নম্বরের জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা তার সঙ্গীদের ব্যাপারটা জানায়। আমরা তখন ভেতরে কাজ করছিলাম। কিছুই জানতে পারিনি। ওকে মেরে মুখ ফাটিয়ে দিয়ে ওরা চলে যাওয়ার পর পাশের গ্রসারি শপ থেকে খবরটা

দিয়েছিল। ভাগ্যিস তখন একজন ডাক্তার রেস্টুরেন্টে খাচ্ছিলেন, তিনিই চিকিৎসা করেন ওর। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেলাই করে ফেরত দিয়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া তো যেত না। তা হলে পুলিশ জানতে পারত, কাগজ না থাকার অপরাধে অ্যারেস্ট করত ওকে।'

আকবর ভাই চলে গেলে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল শাহিন। এই দেশ অনেক ঠকিয়েও যে টাকা তাদের দিচ্ছে তা বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে যথেষ্ট। পঞ্চাশ হাজার টাকা মাসে হাতে পাওয়া কম কথা নয়। কিন্তু তার বদলে তাদের থাকতে হচ্ছে চোরের মতো। অসুখ হলেও হাসপাতালে যাওয়ার উপায় নেই। জ্যাকসন হাইট বলে একটা এলাকায় কয়েকজন বাংলাদেশি আর পাকিস্তানি ডাক্তার আছেন, তাঁদের কাছে গিয়ে লুকিয়ে চিকিৎসা করাতে হয়। এভাবে কতদিন থাকা যায়? কিন্তু কোনও উপায় নেই। এ দেশ থেকে বের হওয়ার সব পথ বন্ধ।

আজ তেমন পরিশ্রম হয়নি। ভিড় ছিল হালকা। লুকা মনে করিয়ে দিল কাল রাত চারটে পর্যন্ত খাটতে হবে। শুক্রবারের রাত।

বারোটায় রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে গেলে মালকিন তাকে ডাকল, 'শোনো শাহিন, তোমার কাজ প্রায় ঠিকঠাক আছে। রবিবার আমার রেস্টুরেন্ট বন্ধ থাকে। বাকি ছ'দিন তুমি ঘণ্টায় তিন ডলার করে পাবে। রাজি আছ?'

মাথা নাড়ল শাহিন। আগের রেস্টুরেন্টের চেয়ে বেশি দিচ্ছে মালকিন, কিন্তু দু'জনের কাজ একজনকে দিয়ে করিয়ে নেবে। মালকিন খুশি হলেন, 'গুড। তবে কাল-পরশু জুলি আসবে বলে তোমার পেমেন্ট কমিয়ে দিচ্ছি না। আর হ্যাঁ, জুলিকে আমি কত দিচ্ছি তা নিয়ে তুমি মোটেই মাথা ঘামাবে না। জুলি এই দেশের একজন বোনাফাইড নাগরিক। তোমাকে আমি আজ আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারছি না। আমার শরীরটাও ভাল নেই, তা ছাড়া আমি চাই না ফর নাথিং তুমি ওখানে যাবে আর দিয়াগো সেটা জানুক। তুমি আমার অফিসরুমে রাত্রে ঘুমোতে পারো কিন্তু সাবধান একদম নোংরা করবে না। কাল রেস্টুরেন্টের দরজা না খোলা পর্যন্ত এমনভাবে থাকবে যেন লোকে না বুঝতে পারে ভেতরে লোক আছে। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল শাহিন।

বাইরে থেকে তালা দিয়ে ওরা চলে গেল। যাওয়ার আগে লুকা জানিয়ে গেল কিচেনে তার জন্যে খাবার রেখে গেছে।

আলো জ্বালা নিষেধ। পৃথিবীটা ক্রমশ চুপচাপ হয়ে গেলে টয়লেটে গিয়ে আন্দাজে আন্দাজে স্নান করে নিয়ে আকবরভাই-এর দিয়ে যাওয়া সুটকেস খুলে পাজামা পরে বেশ স্বস্তি হল তার। অফিসঘরে ঢুকে মালকিনের ইজিচেয়ারটা ঠিক করে নিল। আরামেই ঘুমোতে পারবে সে। তারপর কিচেনে গিয়ে জিরো পাওয়ারের আলোটা জ্বালল। এর আলো এত কম যে বাইরে থেকে কারও চোখে পড়বে না। চিকেন কারি আর তন্দুরি রুটি রেখে গেছে লুকা। পরিমাণে এত যে পুরোটা খেতে পারবে না সে। হাত বাড়াতে গিয়ে তার মনে পড়ল। সোজা চলে এল বার কাউন্টারে। একটা হুইস্কির বোতল বের করে কিছুটা গ্লাসে ঢেলে জল মিশিয়ে নিল সে। একটু একটু করে চুমুক দিতে দিতে অনেকটা খাবার খেয়ে নিল শাহিন। খাবার শেষ হলে গ্লাসে আরও একটু হুইস্কি ঢেলে বোতলটাকে ঠিক জায়গায় রেখে দিল।

গ্লাসটা শেষ হতে না হতেই ঘুম পেয়ে গেল। আলো নিভিয়ে মালকিনের অফিসঘরে চলে এসে ইজিচেয়ারে শরীর মেলে দিতে না দিতেই টেলিফোনটা এমন কর্কশ শব্দ তুলল যে চমকে উঠেছিল শাহিন। বুকের ভেতরটায় যেন ধক শব্দ হল। ফোনটা বেজেই চলেছে। শূন্য রেস্টুরেন্টে আওয়াজটা যেন বেশি জোরালো হচ্ছে। কে ফোন করছে? রনি বা আকবরভাই নয় তো। উঠতে গিয়েও সামলে নিল শাহিন। যে-ই হোক এখন তার উচিত হবে না রিসিভার তোলা। কিন্তু যদি মালকিন ফোন করেন? কী করা যায়? না। নিজেকে বোঝাল সে। যেই হোক, ফোন ধরবে না সে।

বাজতে বাজতে শেষ পর্যন্ত থেমে গেল যন্ত্রটা। শব্দটা চলে যেতেই মনে হল তার শরীরের নার্ভগুলো আরাম পেল। আঃ!

পরদিন সকালে এসে যাবতীয় হুকুম দেওয়ার পর মালকিন হাসলেন, 'তোমার ঘুম বুঝি খুব গভীর! ঘুমিয়ে পড়লে কিছুই শুনতে পাও না?'

কৌতূহলী হয়ে তাকাল শাহিন।

‘কাল রাত একটার সময় ফোন করেছিলাম। অনেকক্ষণ বাজলেও তুমি ফোন তোলোনি।’

‘আপনি বলে গিয়েছিলেন যেন কোনও শব্দ না করি!’

‘ও, তুমি তখন জেগে ছিলে? খুব ভাল করেছ ফোন না ধরে। বাই দ্য বাই, তোমার জন্যে একটা ভাল খবর আছে।’ হাসলেন মালকিন।

‘কী খবর?’ উৎসুক হল শাহিন।

‘নো নট নাউ। রবিবার। সেদিন আমাদের ছুটি, সেদিন সব কথা হবে।’

শুক্রবার সন্ধ্যের পরে জুলি এল। পরনে জিনস, পেটের কাছে দুই ইঞ্চি ফাঁকা, ওপরে গেঞ্জি। এসেই মালকিনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। হেসে গড়িয়ে গিয়ে কথা বলল। তারপর মালকিনের অফিসঘরে ঢুকে পড়ল। কিচেনের সামনে লুকার পাশে দাঁড়িয়ে শাহিন ওদের দেখছিল। লুকা বলল, ‘মেয়েটার মনটা ভাল, কিন্তু স্বামীভাগ্য খুব খারাপ।’

‘কেন?’

‘এর মধ্যে তিনবার বিয়ে করেছে কিন্তু কোনও বিয়েই টেকেনি। অথচ দ্যাখো ওর মুখে হাসি নেভেনি। ও জানে কী করে সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করতে হয়।’ লুকা বলল।

অফিসঘর থেকে বেরিয়ে এল জুলি। এখন ওকে চিনতেই পারছিল না শাহিন। লেদারের মিনি স্কার্ট হাঁটুর অনেক ওপরে শেষ হয়েছে। ওপরে হাত কাটা লাল জামা যার নীচের দুই প্রান্ত নাভির ওপরে কায়দা করে বাঁধা। বেরিয়েই শরীরটা এমনভাবে ঝাঁকাল যে ওর সুন্দর নিতম্ব এবং বুক নেচে উঠল।

‘শাহিন! প্লিজ কাম হিয়ার!’ মালকিন ডাকলেন।

এগিয়ে গেল শাহিন। মালকিন বললেন, ‘দিস ইজ শাহিন ফ্রম বাংলাদেশ, আমাদের নতুন ওয়েটার। আর এ হল—!’

তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে জুলি বলল, ‘আমি জুলি। Zoo Li! হাই, গ্ল্যাড টু মিট ইউ।’ হাত বাড়াল জুলি।

‘হাই।’ বলে হাত মেলাল শাহিন।

জুলি বলল, 'আমরা একসঙ্গে কাজ করব। রাত বারোটা পর্যন্ত তুমি বাঁ দিকের টেবিলগুলোর অর্ডার নেবে, আমি ডানদিকেরগুলোয়। বারোটার পরে আমরা সাইড পালটাব। ওকে!'

'ঠিক আছে।'

সাড়ে আটটা বাজতেই ভিড় শুরু হয়ে গেল। শাহিন মুগ্ধ হয়ে দেখল জুলি পাখির মতো উড়ে উড়ে টেবিলে টেবিলে কাজ করে চলেছে। কোনও কোনও কাস্টমার চেঁচিয়ে কিছু বললে জুলিও চেঁচিয়ে জবাব দিচ্ছে হাসি মুখে। আজ কাজ করতে খারাপ লাগছিল না শাহিনের। বেশ মজাই লাগছিল। লোকে খাচ্ছেও বেশি, বিল হচ্ছে মোটা। রাত বারোটার সময় কাউন্টারের সামনের টুলগুলো ভরে গেল মদ্যপানের জন্যে। জুলি তখন ইশারা করল শাহিনকে। সরে গেল কিচেনের দিকে। কিন্তু বিল আনতে এবং পেমেন্ট পৌঁছোতে যখনই সে কাউন্টারের দিকে যাচ্ছিল, তখনই টুলে বসা মদ্যপদের কেউ না কেউ তার দিকে হাত বাড়াচ্ছিল। শাহিন ভয় পাচ্ছিল যে-কোনও মুহূর্তে একটা গোলমাল শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু জুলি এমন চমৎকারভাবে ম্যানেজ করল যে চারটে বেজে গেল কখন তা শাহিন টেরই পেল না। চারটে বাজতেই জুলি ঢুকে গেল মালকিনের অফিসঘরে। মিনিট তিনেক বাদে বেরিয়ে এল জিনস আর গেঞ্জি পরে। কাঁধে ব্যাগ। রেস্টুরেন্ট তখন ফাঁকা। লুকার হাত থেকে খাবারের প্যাকেট আর মালকিনের দেওয়া খাম নিয়ে গুড নাইট বলে বেরিয়ে গেল সে।

শনিবার রাত্রে এত ভিড় হল যে মালকিন ফোন করে মাসলম্যান আনালেন। আমেরিকায় বিভিন্ন পেশায় যারা যুক্ত সেইসব অসংগঠিত কর্মীরা একটা না একটা নিয়োগ সংস্থার অধীনে থাকে। সেই সংস্থাকে ফোন করলে তারা উপযুক্ত লোক পাঠিয়ে দেয়। মাসলম্যান বলশালী মানুষ। ক্যারাটে বা কুংফু ইত্যাদিতে দখল আছে। রেস্টুরেন্টে কোনও ক্লায়েন্ট গোলমাল করলে মাসলম্যান তাকে বিনীতভাবে শান্ত থাকতে বলে। অবাধ্য হলে তাকে বাইরে বের করে দেয়। একজন মাসলম্যান একসঙ্গে অন্তত জনাপাঁচেক মানুষের মোকাবিলা করতে পারে। রাত

দশটায় যে লোকটি এল তার পরনে জ্যাকেট, মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। মালকিনের সঙ্গে কথা বলে সে দরজার পাশে দুটো হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। শাহিন লক্ষ করল লোকটিকে দেখার পর থেকে চিৎকার চেঁচামেচি অনেক কমে গেল। যারা অকারণে টেবিল বাজাচ্ছিল তারা হাত গুটিয়ে নিল। শাহিন বুঝল জুলি লোকটিকে চেনে। বিল আনতে বা পেমেন্ট জমা দিতে যখনই জুলি কাউন্টারে যাচ্ছিল তখনই হেসে লোকটার সঙ্গে কথা বলছিল, লোকটাও মাথা নাড়ছিল। এক ফাঁকে কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে লুকা তাকে জানিয়ে গেছে, এই লোকটা ঘণ্টাপিছু পনেরো ডলার নেবেই।

এঁটো প্লেটগুলো তুলে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার সময় মনে মনে অঙ্ক কষল শাহিন। পনেরো যদি ঘণ্টা পিছু হয়, তা হলে দশ ঘণ্টায় দেড়শো ডলার? বাংলাদেশের টাকায় প্রায় সাড়ে দশ হাজার টাকা। ভাবতেই শরীর ঝিমঝিম করে উঠল।

কোনও ঝামেলা ছাড়াই রাতটা শেষ হল। ঘড়িতে চারটে বেজে পাঁচ, জুলি যখন পোশাক পালটাতে গেল তখন মালকিন লোকটার হাতে একশো ডলার দিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

লোকটা পকেট থেকে দশ ডলার বের করতেই মালকিন হাত নাড়লেন, 'নো নো। আই অ্যাম পেয়িং ইউ হান্ড্রেড। ওকে?'

মাথা নাড়ল লোকটা, তারপর বেরিয়ে গেল।

আজ জুলি যাওয়ার সময় শাহিনের গালে আঙুল ছুঁইয়ে গেল। এত অপ্রস্তুত হয়ে গেল শাহিন যে আলি পর্যন্ত হেসে উঠল। মালকিন হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'এতদিন এদেশে আছ, কোনও মেয়ে তোমাকে স্পর্শ করেনি?'

মাথা নেড়েছিল শাহিন, 'নো।'

লুকা বলল, 'দেন রিমেম্বার দিস মর্নিং।'

বেরিয়ে যাওয়ার আগে মালকিন বললেন, 'কাল ঠিক বারোটার সময় তোমাকে ফোন করব। ফোনটা ধোরো।'

স্নান করে হুইস্কি আর খাবার খেয়ে ইজিচেয়ারে শুতে শুতে প্রায় পাঁচটা বেজে গেল। কিন্তু শোওয়ামাত্র আজ ঘুম এল না। প্রতিদিন যদি

দেড়শো ডলার হয় তা হলে ছুটির দিনগুলো বাদ দিলে ছাব্বিশ দিনে কত হয়? হিসেব করল শাহিন। তিন হাজার ন'শো। বাংলাদেশের টাকায় দু'লাখ তিয়াত্তর হাজার টাকা। আই বাপ! সে উঠে বসল। এত টাকা! শুধু ভাল স্বাস্থ্য আর কারাটে জানলে এই দেশে রোজগার করা যায়? একথা যদি আগে জানত তা হলে ছেলেবেলায় সাইকেল চালিয়ে ফরিদপুর শহরে যেত। ওখানে কারাটের ক্লাস হত বলে শুনেছিল সে। ওটা জানা থাকলে সে প্রত্যেক মাসে আব্বুকে দু'লক্ষ টাকা পাঠাতে পারত। সেই টাকা হাতে পেলে গর্বে বুক ফুলে উঠত আব্বুর। গ্রামের সবাইকে তার কথা পাঁচমুখে বলত। কী করা যাবে! নিজেকে বোঝাল শাহিন। উনপঞ্চাশ হাজার যে পাঠাচ্ছে তাই বা কম কী? এই টাকার কথা তো ওখানে থাকলে স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। তাদের গ্রাম কেন, আশেপাশের কোনও গ্রামের ছেলে মাসে বাপ-মাকে ওর অর্ধেক টাকা দেয় কিনা সন্দেহ।

সুটকেস থেকে কাগজ-কলম বের করে চিঠি লিখতে শুরু করল শাহিন। 'আমি ভাল আছি। একমাসের জন্যে অন্য একটি কাজ করছি। মাস শেষ হলে আগের কাজের জায়গায় ফিরে যাব। তুমি আগের ঠিকানায় চিঠি দিলে পেতে অসুবিধে হবে না। তোমরা কেন এখনও গ্রামীণ ফোন নিচ্ছ না? এই চিঠি পেয়ে সেলিমকে বলবে ফরিদপুরে গিয়ে প্রি-পেড ফোন কিনে আনতে। এমন কিছু দামি নয়। আমার এই কাজের জায়গার ফোন নম্বর দিলাম। তুমি শুধু একবার ফোন করে তোমাদের নতুন গ্রামীণ ফোনের নম্বর জানালে আমিই কল করব। তা হলে সপ্তাহে অন্তত একবার কথা বলা যাবে। তোমাদের সঙ্গে কত বছর কথা বলিনি। আম্মুর গলার স্বর কত বছর শুনিনি। তোমাদের কথা ভেবে আমি এতদূরে কাজ করে চলেছি। তোমরা ফোন কিনে কথা বললে আমি সুখী হব।...'

ঘুম ভাঙল টেলিফোনের আওয়াজে। প্রচণ্ড চিৎকার করছে যন্ত্রটা। উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তারপরেই মনে পড়ল। লাফিয়ে ঘরের বাইরে এসে কাউন্টারের পেছনে রাখা ঘড়ির দিকে তাকাল শাহিন। ঠিক বারোটা বাজে। রিসিভার তুলল সে, 'হ্যালো?'

'স্টিল স্লিপিং?' মালকিনের গলা।

'না— মানে—।'

'শোনো, ঠিক একটার সময় তুমি একটা ফ্ল্যাটে যাবে। সেখানে ক্যাথরিন নামে এক ভদ্রমহিলা থাকেন। ক্যাথরিন তোমার সমস্যার সমাধান করতে পারে। একটা কাগজে ওর ঠিকানা লিখে নাও।' মালকিন বললেন।

ঠিকানাটা লিখল শাহিন। ফোন নম্বরও। তারপর খেয়াল হল, 'কিন্তু আমি এখান থেকে বের হব কী করে। দরজা তো বাইরে থেকে বন্ধ করে আছে।'

'জানি। তুমি কিচেনে চলে যাও। পিছনের দরজা খুললে একটা প্যাসেজ দেখতে পাবে। প্যাসেজটার শেষে আর একটা দরজা আছে। ওটা খুললে রাস্তায় পড়বে। ফায়ার ম্যানদের জন্যে করতে হয়েছে। কাউন্টারের নীচে দুটো ভারী তালা আর চাবি আছে। দুটো দরজাতেই তালা দিয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, একটু সেজেগুজে যেয়ো।' ফোন রেখে দিলেন মালকিন।

পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে স্নান সেরে সেজেগুজে দুটো দরজায় তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল শাহিন। এবং তখনই তার খিদে পেল। এই তল্লাটটা ঘুরে দেখার সুযোগ সে পায়নি। এই দুপুরবেলাতেও চারধার বেশ ফাঁকা। এখানে পুলিশ আসার সম্ভাবনা কম। ভাবতেই আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। কিছুটা হেঁটে 'ম্যাকডোনাল্ড' লেখা ফাস্টফুড রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল সে। একটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর ছোট মিল্ক শেক নিয়ে জানালার পাশের টেবিলে বসল। আড়াই ডলার বেরিয়ে গেল। তার একঘণ্টার রোজগার। একশো পঁচাত্তর টাকা। আলুভাজা আর ঘন দুধের দাম। তবে আলুভাজা পরিমাণে এত বেশি দেয় যে খেয়ে শেষ করা যায় না।

খেতে খেতে ঠিকানাটা দেখল সে। মালকিন যেভাবে বলেছে সেভাবে হাঁটলে পৌঁছোতে অসুবিধে হবে না। তার কি একবার ক্যাথরিনকে ফোন করা উচিত? মুশকিল হল, সামনাসামনি ঠোঁট নাড়া দেখে সে বেশিরভাগ মানুষের উচ্চারণ বুঝতে পারলেও টেলিফোনে অনেক কথাই অবোধ্য থেকে যায়।

পর পর চারটে ব্লক হেঁটে এল সে। সেই রাতে মালকিনের ফ্ল্যাটে সে যেদিকে গিয়েছিল তার বিপরীত দিকে। রাস্তাটা বাঁক নিতেই নদী চোখে পড়ল। বেশ বড় নদী। রাস্তার এপাশে লেখা রয়েছে 'রিভারসাইড রোড'। ঠিকানা মিলিয়ে বিশাল বাড়িটার সামনে পৌঁছে দেখল দরজা বন্ধ। কাছে-পিঠে কোনও মানুষ নেই। দরজার গায়ে একটা বোর্ডে ফ্ল্যাটের নম্বরগুলো লেখা রয়েছে। ক্যাথরিন যে ফ্ল্যাটে থাকেন তার নম্বর চাপ দিল সে। আধ মিনিট পরে গলা কানে এলে, 'ইয়েস?'

শাহিন ওপরে তাকাল। সাউন্ডবক্স ওপরে। সে বলল, 'আই অ্যাম শাহিন। সারা আস্কড মি টু সি ইউ?'

'কে তোমাকে পাঠিয়েছে?'

'মিসেস সারা প্লাটিনি।'

'ওকে।'

খট করে শব্দ হল এবং দরজাটা খুলে গেল। আকাশবাণী হল, 'ভেতরে এসো।'

ভিতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। নিজের ঘরে বসে কে এসেছে জেনে নিয়ে রিমোট টিপে দরজা খোলা বন্ধ করা যায় এখানে। ফরিদপুরের লোকের কাছে ম্যাজিক বলে মনে হবে।

চারতলা ফ্ল্যাটের দরজা যিনি খুললেন তাঁকে দেখে শাহিনের খুব ভাল লাগল। ঠিক মা-মা চেহারা। যদিও পরনে প্যান্ট এবং টপ। চল্লিশের গায়ে বয়স। রোগা, চোখ দুটোয় মায়া মাখানো। ভদ্রমহিলা বললেন, 'শাহিন?'

'ইয়েস আপা।' বলে ফেলল শাহিন।

'আপা? হোয়াটস দ্যাট? কল মি ক্যাথি। কাম ইন।'

সুন্দর সাজানো বসার ঘর। ক্যাথি বললেন, 'তোমার এখানে চিনে আসতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হয়নি? গুড। মিসেস প্লাটিনি বলেছিলেন, তুমি তিরিশের কাছাকাছি, কিন্তু আমার তো দেখে মনে হচ্ছে সবে কুড়ি পেরিয়েছ।' হাসলেন তিনি।

বয়সের তুলনায় তাকে কমবয়সি দেখায়, এটা ভাল কি মন্দ বুঝতে পারল না সে।

ক্যাথি জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্লাটিনি তোমাকে নিশ্চয়ই সব বলেছে।'

'না। উনি শুধু বলেছেন আপনি আমার সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন।'

'আমি সমাধান করব?' উলটো দিকের সোফায় বসে বুকে হাত রাখলেন ক্যাথি। 'আমি কে? কী ক্ষমতা আমার? ওয়েল, তোমার সমস্যার কথা পরিষ্কার করে বলো।'

শাহিন বলল।

ক্যাথির কপালে ভাঁজ পড়ল, 'কিন্তু তুমি এদেশে ঢুকলে কী করে?'

শাহিন এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, 'সেটা অনেক লম্বা গল্প।'

'ওকে! ঢুকে তো পড়েছই। এখন বেরোতে পারছ না, তাই তো?'

'হ্যাঁ। দেশে ফিরতে হলে টিকিট কাটার সময় পাসপোর্ট দেখাতে হয়। এখানকার এয়ারপোর্টে গিয়ে বোর্ডিং কার্ড নেওয়ার সময় ওরা দেখবে সেই পাসপোর্টে ভিসার ছাপ আছে কিনা। আমার কোনওটাই নেই।'

'আই সি। যদি ফিরে না যাও, যেমন আছ তেমন যদি থাকো?'

'তা হলে প্রত্যেক মুহূর্তে ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে। পুলিশ জানতে পারলেই ধরে নিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেবে। পাসপোর্ট হয়ে গেলে সেটা করতে পারবে না। আমি অনেক বেশি টাকায় চাকরি করতে পারব। এখন প্রত্যেক মাসে দেশে সাতশো ডলার পাঠাই, সেটা তিনগুণ বাড়িয়ে দিতে পারব। দেশে ওরা ভালভাবে থাকবে।' শাহিন বলল।

'তার মানে পাসপোর্ট ভিসা পেলেও তুমি দেশে গিয়ে সেটলড হবে না?'

'না। ওখানে রোজগার নেই। তবে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলে দেখতে যেতে পারব।'

'দেশে তোমার কে কে আছে?'

'বাবা-মা-ভাই-বোন।'

'বউ?'

লজ্জা পেল শাহিন, 'আমি দেশে বেকার ছিলাম, বিয়ের কথা উঠতই না।'

'তুমি কি একটা সফট ড্রিঙ্ক নেবে?'

'না না। ধন্যবাদ।'

'ওয়েল, এবার বলি। আমাকে সতেরো বছর বয়সে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল সারাজীবন একা থাকার। ওই বয়সে আমার জীবন বাঁচাতে ডাক্তার অপারেশন করেছিলেন যার জন্যে আমি কোনওদিন মা হতে পারব না। যে-কোনও ছেলেই বিয়ের পর সন্তান চায়। পরে যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল তারা মা হতে পারব না জেনে চুপচাপ সরে গেছে। আমি কিছু মনে করিনি। আমি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। ভাল মাইনে পাই। একা থাকতে কোনও সমস্যা হত না। কিন্তু কিছুদিন হল আমি একটু একটু করে হাঁপিয়ে উঠছি। এই বড় ফ্ল্যাটে রাত্রে একা থাকতে পারছি না। মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে যাবে। আই নিড এ পার্টনার।' হাসল ক্যাথি, 'আবার যাকে তাকে পার্টনার করে নিয়ে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্লাটিনি আমার ব্যাঙ্কে মাঝে মাঝে আসে। বেচারা কয়েকবার বিয়ে করেও টেকাতে পারল না। ও আমার একাকিত্বর কথা জানত। বলেছিল, 'পুরুষদের কখনও বিশ্বাস কোরো না।' মুশকিল হল আমি কোনও মেয়েকেও পার্টনার করতে পারব না। সে যদি লেসবি হয়! ওঃ, কী ভয়ংকর!'

'আমার সমস্যার সমাধানের কথা হচ্ছিল—!' মূল প্রসঙ্গে আনতে চাইলে শাহিন।

'সেকথাই তো বলছি। তুমি এই ফ্ল্যাটে থাকতে পারো। ওই ঘরটা ব্যবহার করবে। আমি একটু অলস, তাই তোমাকে সংসারের সব কাজ করতে হবে। শুধু আমার বেডরুমে তুমি কখনওই ঢুকবে না। তুমি মদ খাও?' ক্যাথি তাকাল।

'না।'

'গুড। স্মোক করো?'

'না।'

'বাঃ। তুমি তোমার কাজে ঠিক সময়ে বেরিয়ে যাবে, আমাকে বিরক্ত করবে না। আমি দু'মাস তোমার ব্যবহার লক্ষ রাখব। ওকে?' ক্যাথি খুব সিরিয়াস।

'কিন্তু তাতে আমার সমস্যা কী করে মিটবে?'

'এই দুটো মাস তোমাকে পুলিশের চোখের বাইরে থাকতে হবে। দু'মাস পরে আমি দুটো জিনিস করতে পারি। এক, তোমাকে চলে যেতে বলতে পারি। দুই, তোমার সঙ্গে কাগজে-কলমে বিয়ে করতে পারি।'

'বিয়ে?' চমকে উঠল শাহিন।

'লুক! আমি জন্মসূত্রে আমেরিকান সিটিজেন। তোমাকে যদি বিয়ে করি তা হলে আমার স্বামী হিসেবে তুমি যদি সিটিজেনশিপের আবেদন করো তা হলে সরকার তোমাকে তা দিতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে, ধরে নাও, তুমি মাস আটেকের মধ্যে আমেরিকান সিটিজেন হয়ে যাবে। কেমন হবে ব্যাপারটা?' সুন্দর করে তাকালেন ক্যাথি।

'কিন্তু আপনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়।' মিনমিন করল শাহিন।

'তাতে কিছু এসে যায় না। আইনে এ ব্যাপারে কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু আমার কয়েকটা শর্ত আছে। এই যে দু'মাস তোমাকে দেখার জন্যে এখানে রাখছি তা বিনা লাভে নয়। সকালে চা, ব্রেকফাস্ট, রাতে ডিনার তৈরি করতে হবে তোমাকে। বাসন ধোয়া, ঘর পরিষ্কার করা, কাপড় কাচার কাজগুলো ঠিকঠাক করতে হবে। আমার এগুলো করতে মোটেই ইচ্ছে করে না। মেড ভাড়া করলে প্রচুর টাকা বেরিয়ে যাবে। তুমি করে দিলে, সেটা বাঁচবে। তোমার কাজে সন্তুষ্ট হলে যদি বিয়ে করি তা হলে দুটো শর্ত তোমাকে মানতে হবে। এক, স্বামী বলে ভেবে নিয়ো না যে আমার সঙ্গে সেক্স করার অধিকার তোমার আছে। আমার বেডরুমে আমি থাকলে তুমি ঢুকবে না। দুই, তুমি যা রোজগার করবে তার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আমাকে দিতে হবে।'

'টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আপনাকে দিলে আমি দেশে কী করে টাকা পাঠাব?'

'সেটা তোমার সমস্যা। সিটিজেনশিপ পেলে তোমার রোজগার তিন-চার গুণ বেড়ে যাবে। দিতে আপত্তি কী?'

'কিন্তু সিটিজেন হওয়ার আগের মাসগুলোতে তো রোজগার বাড়বে না।'

'এখন কত পাও?'

'প্রায় আটশো ডলার।'

'ঠিক আছে দুশো করে প্রত্যেক মাসে আমার কাছে ধার থাকবে। সিটিজেনশিপ পেয়ে গেলে সেটা শোধ করে দেবে। এই উপকারটুকু আমি করতে পারি।' উঠে দাঁড়ালেন ক্যাথি, 'অনেক কথা বললাম। এবার আমি একটু বিশ্রাম নেব।'

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল শাহিন। ক্যাথি বলল, 'ভেবে দেখো। প্লাটিনির সঙ্গে কথা বলো। আমি সকাল পৌনে আটটায় বেরিয়ে যাই। ব্যাঙ্ক থেকে ফিরতে রাত আটটা হয়ে যায়। যদি রাজি থাকো তা হলে হয় আজ সন্ধেবেলায় ফোন করে এসো, না পারলে সামনে শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। শনি-রবি আমার ছুটি।'

খুব বিনীতভাবে বিদায় নিয়ে রেস্টুরেন্টে ফিরে এল শাহিন। দুটো তালা খুলে আবার বন্ধ করে রেস্টুরেন্টের ভেতর এসে সে একটা চেয়ার টেনে বসল। কী করা যায়? ব্রেকফাস্ট তৈরিটা হয়তো ম্যানেজ করতে পারবে কিন্তু ডিনার? ক্যাথি ডিনারে কী খায়? যাই খাক তা তাকে সন্ধের আগে বানিয়ে রেখে আসতে হবে। দু'মাস ধরে পরীক্ষা দেওয়ার পর ক্যাথির পছন্দ হলে তবে বিয়ের কথা উঠবে।

শাহিন মাথা নাড়ল। বিয়ে কি ছেলেখেলা? অন্তত পনেরো বছরের বড় একজন মহিলাকে বিয়ে করেও চাকরের মতো থাকতে হবে? কোনওদিন এই বউ নিয়ে দেশে গিয়ে আর আম্মুকে দেখাতে পারবে না। সে তার মায়ের বড় ছেলে। আম্মুর বয়স তো ক্যাথির কাছাকাছি। অসম্ভব। তা ছাড়া দু'মাস পরে যদি ক্যাথি নারাজ হয় তা হলে? শুধু থাকার জায়গার জন্যে ক্যাথি তাকে দু'বেলা খাটিয়ে নেবে। তার চেয়ে মালকিনের ওই ইজিচেয়ারে ঘুমানো ঢের আরামদায়ক।

মন হালকা হল। ঘড়ি দেখল সে। এখন আগের রেস্টুরেন্টে বিশ্রামের সময়। মালিক নিশ্চয়ই বাসায় গিয়েছেন বিশ্রাম করতে। শাহিন উঠে ফোনের নম্বর টিপল। রিং হচ্ছে। তারপরই কাউসারের গলা পেল, 'হ্যালো।'

'কাউসার, আমি শাহিন!'

'আরে! কেমন আছ?'

'ভাল। তোমরা?'

'আমরা ঠিক আছি। রনির খবর জানো তো?'

'হ্যাঁ। কেমন আছে ও?'

'আরও দিন চার-পাঁচ লাগবে ঠিক হতে। ওহো, তোমার ফোন এসেছিল।'

'আমার ফোন?' অবাক হল শাহিন?'

'হ্যাঁ। দেশ থেকে। তোমার ভাই ফোন করেছিল, নম্বর দিয়েছে।'

'সত্যি? কী নম্বর?'

'দাঁড়াও, আকবর ভাইয়ের কাছে আছে, নিয়ে আসছি।'

দ্রুত কাগজ-কলম নিয়ে তৈরি হল শাহিন। মিনিট খানেক পরে কাউসার তাকে বলল, 'লেখো, জিরো জিরো এইট এইট...।'

নম্বর লিখে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল শাহিন। এই নম্বর ঘোরালেই আব্বু-আম্মুর সঙ্গে কথা বলা যাবে। তা হলে চিঠিটা পাঠাবার দরকার হল না।

'শাহিন!' কাউসারের গলা।

'অ্যাঁ! ওহো। হ্যাঁ।'

'আজ তোমার ছুটি?'

'হ্যাঁ।'

'আমারও। চলে এসো। রাত্রে খেয়ে ফিরে যাবে।'

'দেখি!'

ফোন রেখে নম্বরটা মুখস্থ করার চেষ্টা করল সে। এটা নিশ্চয়ই গ্রামীণ ফোনের নম্বর। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে সে নম্বর টিপতেই শুনতে পেল, 'দিস ফেসিলিটিস আর নট অ্যাভেলেবল ইন দিস টেলিফোন।' যাচ্চলে। এই ফোন থেকে বাংলাদেশে ফোন করা যায় না? ঘোরটা কেটে গেল চটপট। তা হলে? রনিকে সে দেখেছে একটা কার্ড বের করে তার নম্বর টিপে ফোন করতে। দুই ডলারে একশো মিনিট কথা বলা যায়। একটা কার্ডে ওর এক মাস দিব্যি চলে যায়। ওই কার্ড কিনতে হবে। আগের রেস্টুরেন্টের এক ব্লক দূরে পাকিস্তানি দোকানে পাওয়া যায়।

ঘড়ির দিকে তাকাল শাহিন। এখানে রাত নামে সাড়ে সাতটায়। বেশ দেরি আছে। আগের রেস্টুরেন্টে পৌঁছে পাকিস্তানির দোকান থেকে কার্ড কিনে ফোন করে এখানে ফিরতে একটু রাত হতেই পারে। এই শহরে তো সারা রাত মানুষ রাস্তায় হাঁটে। ফরিদপুরের বাসায় ফোন করে সবার সঙ্গে কথা বলার জন্যে বুকের ভেতরের ইচ্ছেটা ছটফটিয়ে উঠল। সে মন স্থির করামাত্রই টেলিফোনের রিং শুরু হয়ে গেল। খুব বিনীত শব্দে বাজছে। এই টেলিফোনটা থেকে এক এক সময় এক এক রকমের আওয়াজ বের হয়। কিন্তু মালকিন বলেছেন, আগে থেকে বলা না থাকলে রিসিভার না তুলতে। মালকিনের কথা মনে আসতেই সে ধন্দে পড়ল। ক্যাথির সঙ্গে যেসব কথা হয়েছে তা ওঁকে জানানো উচিত ছিল, কিন্তু সেটা কাল রেস্টুরেন্ট না খুললে জানানো সম্ভব নয়। সে নিজের সিদ্ধান্ত না জানিয়ে মালকিন কী বলেন তা আগে শুনবে।

ফোনটা তখন শান্ত হয়েছে। শাহিন কাউন্টারের ভেতরে ঢুকল। পেছনে একটা সাদা বোর্ডে কয়েকটা টেলিফোন নম্বর লিখে মালকিন ঝুলিয়ে রেখেছেন। জরুরি নম্বরগুলো। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে মুখে হাসি ফুটল তার। সব শেষে লেখা হোম, পাশে নম্বর। অর্থাৎ, মালকিনকে এই নম্বরে ফোন করলে পাওয়া যাবে। সে যে আবার বের হচ্ছে, ফিরতে রাত হতে পারে, এই খবরটা মালকিনকে জানিয়ে যাওয়া উচিত। এই সময়ে রেস্টুরেন্টে কিছু হয়ে গেলে তার কোনও দায়িত্ব থাকবে না। সে ডায়াল করল নম্বরটা দেখে দেখে। ওপাশে ফোন বাজছে। তারপর মালকিনের গলা, 'হেলো-ও।' 'আমি শাহিন বলছি।'

'ওঃ। তুমি ফোনটা ধরলে না কেন?'

'আপনি করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি আমাকে না বলে রাখলে ফোন ধরতে নিষেধ করেছিলেন, তাই।'

'ও। তুমি এখনই আমার ফ্ল্যাটে চলে এসো। দিয়াগো তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।'

'দিয়াগো?'

'আমার ভাই। তোমাকে ওর কথা বলেছিলাম। বস্টনে থাকে।'

'কিন্তু একটা ফোনের কার্ড কেনা যে খুব জরুরি।'

'কী জন্যে?'

'আমার দেশের বাড়িতে ফোন এসেছে। আমি কথা বলব।'

'ওঃ! মাই গড। তুমি এখানে এসেও কথা বলতে পারবে। এক্ষুনি এসো।' মালকিন ফোন রেখে দিলেন। ওঁর ফ্ল্যাটে গেলে বাংলাদেশের সঙ্গে কথা বলা যাবে? নিশ্চয়ই ওঁর ফ্ল্যাটে আলাদা লাইন আছে। কিন্তু মালকিন জানতেই চাইলেন না, ক্যাথির সঙ্গে কী কথা হল। কেন? উনিই তো পাঠিয়েছিলেন। কিচেনের দিকে এগোল সে।

রাত্রে এসেছিল। সেটা মনে করতে করতে ঠিক পৌঁছে গেল সে মিসেস প্ল্যাটিনির ফ্ল্যাটের সামনে। দরজা খুললেন মালকিন, 'ভেতরে এসো।'

ভেতরে ঢুকে শাহিন বলল, 'আমি ক্যাথরিনের কাছে গিয়েছিলাম।'

'জানি। আই অ্যাম সরি, ওখানে তোমার হবে না।'

'হবে না?' অবাক হয়ে গেল শাহিন।

'পরে বলছি। দিয়াগো এখন স্নান করছে। তোমাকে যে ক্যাথির কাছে পাঠিয়েছি তা ওকে জানানোর দরকার নেই। বুঝলে?' গলা নামিয়ে বললেন মালকিন। অতবড় চেহারা, প্রচণ্ড দাপট যে মহিলার, তাঁকে এখন বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছিল। শাহিন লক্ষ করল এখন মালকিন প্রায় গলা পর্যন্ত ঢাকা ম্যাক্সি পরেছেন। ম্যাক্সির দুই হাত কনুই পর্যন্ত ঢেকেছে।

মাথা নাড়ল শাহিন, 'আমাকে কেন ডেকেছেন?'

'তোমার কথা ভাইকে বলেছি। ওর মাঝে মাঝে অদ্ভুত খেয়াল হয়, বলল, ডেকে পাঠাও।' কথাগুলো বলে মুখ ফিরিয়ে ভেতরের দিকে তাকিয়ে কিছু ভেবে মালকিন ভেতরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন একটু বাদেই, 'স্নান করছে। শোনো, তুমি ক্যাথির ফ্ল্যাটে গিয়ে কী করেছ?'

আকাশ থেকে পড়ল শাহিন, 'আমি? কিছুই করিনি।'

'কেন করোনি?'

অবাক হয়ে গেল শাহিন। মালকিনের প্রশ্নটা বুঝতে পারল না সে।

'তুমি গুডি বয়ের মতো দূরে দূরে বসেছিলে?'

'না মানে, উনিই দূরে বসতে বলেছিলেন।'

'বেডরুমে ঢোকোনি?'

'উনিই নিষেধ করেছিলেন।'

'সেই জন্যে তোমাকে ওর পছন্দ হয়নি।'

'আমি তো ওঁর কথা শুনেছিলাম।'

'ক্যাথি চেয়েছিল ওর কথা না শুনে তুমি ভালবাসা দেখাও।'

'ভালবাসা?'

'আই মিন, ওকে যে তোমার ভাল লাগছে তা বোঝাও। একটু অ্যাগ্রেসিভ হও। তুমি তা করোনি বলে তোমাকে ওর ভীষণ কোল্ড বলে মনে হয়েছে।' হাসলেন মালকিন এবং তখনই দু'হাতে চুল ঠিক করতে করতে লোকটা ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। মালকিন হাত নেড়ে বলল, 'মিট মাই ব্রাদার, দিয়াগো, হি ইজ শাহিন।'

'হাই!' দিয়াগো বোতাম খোলা নির্লোম বুকে হাত বোলাল। সেখানে উল্কিতে মাছ-মানবীর মুখ আঁকা।

উঠে দাঁড়িয়েছিল শাহিন, বলল, 'হ্যালো।'

'ইউ আর ইন্ডিয়ান?'

'নো! আই অ্যাম ফ্রম বাংলাদেশ।'

'ও! বাংলাদেশ।' মাথা নাড়ল দিয়াগো।

মালকিন বললেন, 'বেচারার কাছে পাসপোর্ট নেই।'

'ইয়া!' তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'ওকে কত দাও?'

'বেশি দিই, থ্রি ডলার্স'পার আওয়ার।' মালকিন বললেন।

হঠাৎই হা-হা শব্দে হাসল দিয়াগো, 'তুমি সুযোগ পেয়ে ওকে এক্সপ্লয়েট করছ। লুক সান, তুমি ড্রাইভিং জানো?'

মাথা নাড়ল শাহিন, না।

'অবশ্য জানলেও কোনও লাভ হত না। তুমি তো লাইসেন্স পেতে না। তুমি লিখতে-পড়তে পারো? ইংলিশ?' দিয়াগো তাকাল।

মাথা নাড়ল শাহিন, 'পারি। আমি কমার্সের ছাত্র ছিলাম।'

'গুড। হিসেব রাখতে নিশ্চয়ই পারবে?'

দিয়াগো তার দিদির দিকে তাকাল, 'ওকে বিশ্বাস করা যায়?'

'আই ডোন্ট নো। তুমি যাচাই করে দ্যাখো।'

'হে সান, আর ইউ ম্যারেড?'

'নো।'

'গার্ল ফ্রেন্ড?'

'নো!'

'অ্যাঁ? আর ইউ গে?'

এ দেশে হোমোদের 'গে' বলা হয়, তা রনির কাছে জেনেছে শাহিন। মাথা নেড়ে না বলল।

'অ! আমি তোমাকে একটা কাজ দিতে পারি। এই মহিলা যখন তোমাকে ওই রেস্টুরেন্টে রাত্রে থাকতে দিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই তোমার ওপর আস্থা রাখা যায়। তুমি পার আওয়ার বারো ডলার পাবে। দিনে দশ ঘণ্টা। মাসে দুই কি তিনদিন ছুটি। কী ভাল শোনাচ্ছে?' দিয়াগো চোখ ছোট করল।

শাহিন মালকিনের দিকে তাকাল। মালকিন কি চোখের ইশারায় না বললেন। সে বলল, 'আমি একটু ভেবে বলতে পারি?'

'শিয়োর!' দিয়াগো ঘড়ি দেখল, 'তুমি আজ কী করছ?'

'কিছু না।'

'লেটস গো টু ভিকিস প্লেস।' তারপর দিদিকে জিজ্ঞাসা করল, 'উইল ইউ জয়েন আস?'

মাথা নাড়লেন মালকিন, 'আই অ্যাম নট ওয়েল।'

'ওয়েল। গিভ মি এ মিনিট!'

দিয়াগো ভেতরে চলে গেলে শাহিন মনে করিয়ে দিল, 'ফোন করতে পারি?'

'করো। দু'ডলারের বেশি বিল উঠলে তোমার মাইনে থেকে কেটে নেব।' সেলফোন বের করে জিজ্ঞাসা করলেন মালকিন, 'নম্বর কত?'

কাগজ দেখে নম্বর বলল শাহিন। ওটা কানে চেপে হাসলেন মালকিন, 'সো কুইক? রিং হচ্ছে।' ফোনটা এগিয়ে দিলেন মালকিন।

শাহিন কানে চাপতেই মেজভায়ের গলা শুনতে পেল, 'হ্যালো!'

'কী রে? তোরা কেমন আছিস?'

শাহিন চিৎকার করে বলল।

'কে? ও, ভাইয়া? ভাল আছি। নম্বর পেয়েছ?'

'হ্যাঁ। আব্বুকে ফোনটা দে!'

'আব্বু ফোন ধরতে চায় না।'

'আমার নাম করে বল।'

'আম্মুর সঙ্গে কথা বলো।'

তারপর ফোনে আম্মুর কান্না ভেসে এল। কথা বলতে গেলেই গলা থেকে কান্না বেরিয়ে আসছে।

'আম্মু, তুমি কাঁদো কেন? কী হয়েছে?' হাত বাড়াল শাহিন। আম্মু ঢোঁক গিলল যেন। বলতে পারল, 'তুই আয়, তুই আয়।'

তারপরেই মেজভাইয়ের গলা, 'তোকে তো অনেকদিন দ্যাখেনি, গলা শুনে কেঁদে ফেলেছে।'

লাইন কেটে গেল। দু'বার হ্যালো বলে ফোন ফিরিয়ে দিল শাহিন।

মালকিন বলল, 'থ্যাঙ্ক গড। দু'মিনিট হয়নি।' তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'শোনো, ভিকিসের ওখানে কোনও মেয়ের সঙ্গে ভাব করবে না। ওখানে কার এডস নেই তা বলা শক্ত। রাত বারোটার মধ্যে রেস্টুরেন্টে ফিরে যাবে।'

মায়ের কান্নার শব্দ কানে চেপে বসেছিল। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল শাহিনের। মাকে ওভাবে কাঁদতে কখনও শোনেনি সে। 'তুই আয়, তুই আয়' ডাকটা যেন বুকের ওপর চেপে বসছিল। দিয়াগোকে সে বলতে চাইল আজ তাকে ছেড়ে দিতে। বলেও ফেলল।

'হোয়াট হ্যাপেন্ড?'

সে খুব সংক্ষেপে বোঝাতে পারল দিয়াগোকে।

স্বাস্থ্যবান লোকটা অবাক হয়ে গেল। তারপর হাসল, 'ইউ আর ড্যাম সেন্টিমেন্টাল! এখন কী করবে? রেস্টুরেন্টে ফিরে গিয়ে একা একা বসে কাঁদবে?'

মাথায় ঢুকল কথাটা। এ ছাড়া সে আর কী করতে পারে!

'লুক শান, দু'-দু'বার বিয়ে করেছিলাম। বিয়ে টেঁকেনি। ডোন্ট আস্ক মি হোয়াই! প্রথম বউ-এর সঙ্গে আমার বাচ্চা মেয়ে থাকে। আমি যাতে তাদের বিরক্ত না করি তাই বউ মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে লাস ভেগাসে। ফোন করলে কথাই বলতে চায় না। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হলে পারি না। তাই বলে আমি মন খারাপ করে বসে থাকব? ফরগেট ইট। তোমার কেস তো অনেক ভাল। নেক্সট টাইম কল করলে দেখবে উনি আর কাঁদছেন না। ট্যাক্সি!'

ট্যাক্সিতে তাকে তুলে দিয়াগো ড্রাইভারকে যা বলল, তা উচ্চারণের জন্যে শাহিনের বোধগম্য হল না। আমেরিকায় সে এতদিন আছে কিন্তু এই প্রথম ট্যাক্সিতে উঠল। চোখের সামনে মিটার ঘুরে ঘুরে বলে দিচ্ছে। এখন কত ভাড়া হয়েছে? 'ভিকিস' লেখা বাড়িটার সামনে যখন ট্যাক্সি থামল তখন ভাড়া উঠেছে আটান্ন ডলার। বাংলাদেশের টাকায় প্রায় চার হাজার টাকা। এর অর্ধেক তাকে মাইনে দিতে চেয়েছে দিয়াগো।

আধা অন্ধকার ঘরে বেশ কিছু পুরুষ এবং নারী গল্প করছে, নাচছে। মাঝখানের লম্বা টেবিলের ওপর প্রায় বিবস্ত্রা সুন্দরীরা বিভিন্নরকমের ভঙ্গি করছে। একটা লোহার থাম ধরে পাক খেয়ে গেল একজন। দিয়াগো তাকে নিয়ে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে আসতেই তিনজন লোক এগিয়ে এসে ওর সঙ্গে হাত মেলাল। শাহিন শুনল তার অবোধ্য ভাষায় ওরা কথা বলছে। যে এইদিকে আসছে সেই দিয়াগোর পিঠ চাপড়ে যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে লোকটা এখানে বেশ জনপ্রিয়।

বার কাউন্টারের সামনের লম্বা টুলে পা ঝুলিয়ে বসে দিয়াগো শাহিনকে বলল, 'বসে পড়ো। কী খাবে বলো? জ্যাক ড্যানিয়েল?'

হেসে মাথা নাড়ল শাহিন। চারধারে এত চিৎকার এবং বাজনা বাজছে যে কথা বলতে হলে চেঁচাতে হবে। দিয়াগোর মনে পড়ল, 'ওঃ, ইয়েস। দেন টেক বিয়ার। গিভ মি জ্যাক, বিয়ার টু হিম।' বারের ওপাশের লোকটাকে হুকুম করল দিয়াগো।

বিশাল চেহারার লোকটা লম্বা বিয়ারের গ্লাস এগিয়ে দিল। শাহিন লক্ষ করল লোকটার নাক ভাঙা। নিশ্চয়ই মারপিট করতে গিয়ে ভেঙেছে। দিয়াগো চিৎকার করল, 'চিয়ার্স!' তাকে গ্লাস উঁচিয়ে ধরতে

দেখে শাহিনও গ্লাস তুলল। কিন্তু বেজায় ভারী বলে নামিয়ে নিল।

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে দিয়াগো বলল, 'এবার কাজের কথায় আসছি। কিছুদিন হল আমি ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায় হাত দিয়েছি। আমার পার্টনারের নাম জো। আমরা মাল ক্যারি করি। কখনও নিউইয়র্ক থেকে ফ্লোরিডা, কখনও নিউইয়র্ক থেকে ডেটন পর্যন্ত মাল নিয়ে যায় আমাদের গাড়ি। ড্রাইভার পালটে যায় বারো ঘণ্টা পর পর। ইউনিয়ন থেকে চাপ দিচ্ছে আট থেকে দশ ঘণ্টা পরে পালটাতে। দেখা যাক।' আবার হুইস্কিতে চুমুক দিল দিয়াগো।

'আমাকে কী করতে হবে?' বিয়ারের স্বাদ এত তেতো যে মুখ বিকৃত করল শাহিন। মনে হচ্ছিল, সে করলার রস খাচ্ছে। এ জিনিস কী করে লোকে খায়? খেলে তো কখনওই নেশা হবে না। না খেলে নিশ্চয়ই দিয়াগো পছন্দ করবে না।

'আমরা একটি বিশ্বাসী লোক খুঁজছিলাম।' দিয়াগো বলল, 'গ্যারাজ থেকে গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার সময় থেকে আবার গ্যারেজে ফেরা পর্যন্ত সে গাড়িতে থাকবে। এসে রিপোর্ট দেবে সে।'

'কী রিপোর্ট?'

'লুক। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের হয়ে গেলে আমরা যে চার্ট দেব তাই ফলো করা ড্রাইভারের কর্তব্য। কিন্তু সেটা যদি না করে তা হলে আমরা জানতে পারব না। ধরো, ফ্লোরিডায় যাওয়ার পথে কোনও এক জায়গায় ওয়ান ফোর্থ মাল ডেলিভারি দিয়ে যাওয়ার কথা। সে সেটা দিল। কিন্তু গাড়ি খালি হয়ে যাওয়া জায়গায় হাফ প্রাইসে লোকাল পার্টির মাল তুলে নিয়ে ফ্লোরিডায় ডেলিভারি দিয়ে দিল, আমরা জানতেও পারলাম না। তা ছাড়া বারো ঘণ্টা অন্তর ড্রাইভার বদলে যাচ্ছে। আমরাই তাদের আগে থেকে ঠিক করে রাখি। কিন্তু, আফটার অল, ওরা তো ভাড়া করা ড্রাইভার। আমাদের লোক গাড়িতে থাকলে দরকার হলেই খবর পেয়ে যাব। কী কী করতে হবে তা আমার পার্টনার তোমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবে।' দিয়াগো গ্লাস শেষ করল। বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল শাহিন। অদ্ভুত ব্যাপার, তেতো ভাবটা অনেক কমে গিয়েছে এর মধ্যে। অর্থাৎ বিয়ারে কয়েক চুমুক দেওয়ার পরে আর তেতো লাগে না।

শাহিন বলল, 'আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন মিস্টার—,' থেমে গেল সে।

'কল মি দিয়াগো।'

'হ্যাঁ, আমি রেস্টুরেন্টে চাকরি করি, বাইরে বের হই না তাই পুলিশ আমার কথা জানতে পারে না। কিন্তু ট্রাকে থাকলে ওদের নজরে পড়বেই।'

'তো? তোমার শরীরে কি লেখা আছে তুমি বাংলাদেশি। পাসপোর্ট নেই।'

'ওরা যদি পাসপোর্ট দেখতে চায়?'

'তোমাকে কোম্পানি একটা আইডেন্টিটি কার্ড দেবে, তাতে লেখা থাকবে তুমি আমাদের রোড ম্যানেজার। যদি অ্যাকসিডেন্ট না হয় তা হলে ওটা দেখলেই পুলিশ আর মুখ খুলবে না। ওরা ভাবতেই পারবে না আমরা কোনও বেআইনি লোককে কাজে নিয়েছি!'

আর একটা বড় চুমুকে গ্লাস শেষ হয়ে গেলে শাহিন জিজ্ঞাসা করল, 'হোয়াই মি? তুমি কোনও আমেরিকান ছেলেকে কাজটা দিচ্ছ না কেন?'

'কারণ তারা বেশি চাইত। অন্তত দিনে দেড়শো ডলার। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

কোথায় দেড়শো ডলার, কোথায় চল্লিশ! জ্যাক এগিয়ে এসে শাহিনের গ্লাস ভরে দিল। দিয়াগো হাসল, 'তোমাকে যেটা বলিনি সেটা হল, গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের হওয়ামাত্র তোমার থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব আমাদের। এই খাওয়ার মধ্যে রয়েছে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার। তা ছাড়া তুমি চা-কফি অথবা বিয়ার খেতে পারো। এগুলোর জন্যে তোমার কাছে আলাদা ফান্ড দেওয়া হবে। সেই ফান্ডের হিসেব তুমি ফিরে এসে দেবে। তার মানে মাসের বেশিরভাগ সময়টায় তোমার পকেট থেকে ডলার বের হবে না। কিন্তু তোমাকে ঘুমোতে হবে গাড়ির ভেতরে। সেখানে পাশাপাশি দু'জন মানুষ শুতে পারে এমন জায়গা আছে।'

দিয়াগোর কথার মধ্যে একটি সুন্দরী মহিলা এসে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'হাই।'

'হাই!'

'ডার্লিং তুমি আমাকে ভুলে গেলে?' সুন্দরীর মুখে অভিমানের মেঘ।

দিয়াগো উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে সুন্দরীকে জড়িয়ে ধরে সশব্দে চুমু খেল। আশেপাশের সবাই দেখল কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না।

সুন্দরী বলল, 'চলো, নাচি।'

'নাচবে? তুমি বরং আমার এই নতুন বন্ধুর সঙ্গে নাচো!'

'নতুন বন্ধু?' শাহিনের দিকে তাকাল সুন্দরী।

'হ্যাঁ। ওর নাম শাহিন।'

সুন্দরী দিয়াগোকে ছেড়ে এগিয়ে এল শাহিনের কাছে, 'হাই হ্যান্ডসাম।'

শাহিন কী বলবে বুঝতে না পেরে কোনওরকমে বলতে পারল, 'হাই।'

চারদিকে চিৎকার চেঁচামেচি, বাজনার শব্দ, কেউ কারও কথা শুনতে না পাওয়ায় আরও চিৎকার করছে। সুন্দরী শাহিনের হাত ধরল, 'চলো, নাচি।'

শাহিন সজোরে মাথা নাড়ল, "আমি নাচতে পারি না।'

হেসে গড়িয়ে পড়ল সুন্দরী, 'পারো না?' তা হলে কি নাচাতে পারো?' ঠিক তখনই একটা লোক এগিয়ে এল, 'লিজা!'

সুন্দরী তাকাল, তাকিয়ে কাঁধ নাচাল।

লোকটি এগিয়ে এসে সুন্দরীর হাত ধরল, 'তুমি আমাকে কথা দিয়েছ, চলো আমার সঙ্গে।' সুন্দরী হাতটা ছাড়িয়ে নিতেই দিয়াগো বলল, 'তুমি যত দ্রুত এখান থেকে চলে যাবে তত তোমার ভাল হবে।'

শোনামাত্র লোকটি চেঁচাল, 'তুমি কে হে?'

শাহিন কিছু বোঝার আগেই লোকটাকে মেঝের ওপর পড়ে যেতে দেখল। যে ক্ষিপ্রতায় দিয়াগো হাত চালিয়েছে, তা এতকাল সিনেমায় দেখেছে সে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে দিয়াগো নির্বিকার। আশেপাশের মানুষ চুপ করে লোকটিকে দেখছে। ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোক এগিয়ে এসে লোকটিকে তুলল। তারপর ওদের একজন বিনীত ভঙ্গিতে

দিয়াগোকে বলল, 'একে আজ প্রথম দেখছি। আপনাকে চিনত না। কিছু মনে করবেন না।' ওরা লোকটিকে প্রায় চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী হাসল দিয়াগোর কাছে গিয়ে, 'আই লাইক ইউ।'

দিয়াগো পানীয়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে সুন্দরীকে বলল, 'এই লোকটা আমার মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে। অতএব তুমি কেটে পড়ো! লেটস গো শান।'

তখনও দ্বিতীয় গ্লাস শেষ হয়নি। শাহিন উঠে পড়ল। বাইরে বেরিয়ে এসে দিয়াগো বলল, 'কাউকে আঘাত করতে আমার ইচ্ছে করে না কিন্তু লোকগুলো এমন পরিস্থিতি তৈরি করে যে হাত আপনাআপনি কাজ করে। যাক গে, কাল দুপুর দুটোয় তুমি গ্যারেজে চলে আসবে। এবার অন্তত দিন দশেকের জন্যে বাইরে থাকতে হবে। কীভাবে গ্যারেজে পৌঁছাবে তা তোমাকে তোমার মালকিন বলে দেবে। বাই।'

দিয়াগো হাঁটা শুরু করেছিল, তাকে থামাল শাহিন, 'আমি কীভাবে রেস্টুরেন্টে ফিরে যাব? এখান থেকে তো অনেকদূরে!'

'তুমি এর আগে এদিকে আসোনি?'

'না।'

'ওই ব্লকের গায়ে পাতাল রেলের সিঁড়ি পাবে। এফ ট্রেন ধরবে।' দিয়াগো চলে গেল।

হাঁটতে শুরু করল শাহিন। শুনশান রাস্তা। জোর হাওয়া দিচ্ছে। বেশ শীত শীত ভাব হাওয়ায়। মনে হচ্ছে এই পৃথিবীতে কোনও মানুষ জেগে নেই।

সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামল সে। আলোকিত স্টেশন চত্বর। তাকে এতদূরে নিয়ে এসে বিয়ার খাওয়ানোর কী দরকার ছিল? ওর প্রস্তাবটা মালকিনের বাড়িতে বসেই বলতে পারত। খামোকা টাকা খরচ হয়ে গেল। ও কী করে জানবে যে ওদের এক টাকা মানে তার সত্তর টাকা।

একেবারে খালি ট্রেন। পুরো কামরায় সে একা। ভয় ভয় করছিল। কামরার ভেতর ম্যাপ টাঙানো, এফ ট্রেনেই উঠেছে সে। কোন কোন

স্টেশনে ট্রেন থামবে দেখতে দেখতে সে তাদের পাড়ার স্টেশনকে আবিষ্কার করল। বহুত দেরি। পরের স্টেশনে দুটো ছেলে উঠল। হাতে গিটার, মিউজিক সিস্টেম, মাইক্রোফোন। পকেট থেকে ডলার বের করে গুনে দু'ভাগ করে দু'জনে নিল। কালো ছেলেটা তার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'মিউজিক?'

মাথা নাড়ল সে, না। ছেলেটা কাঁধ নাচাল। এরা নিশ্চয়ই সকাল থেকে ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে গান গেয়ে রোজগার করে। দেশের বাসে অন্ধ বা ভিখিরিদের দেখা যায় এই কাজ করতে। কিন্তু তাদের হাতে একতারা ছাড়া কিছু থাকে না।

নিজের স্টেশনে নেমে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল শাহিন। সিঁড়ির কাছে যেতে একটা টানেল পার হতে হবে। দূর থেকে সে দেখল একটা বিশাল চেহারার নিগ্রো টানেলের গায়ে হেলান দিয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দ্রুত লোকটাকে পার হতে যাচ্ছিল সে, লোকটা হাত বাড়িয়ে তাকে থামাল, 'টেন বাকস্ প্লিজ। জাস্ট টেন।'

'আমার কাছে ডলার নেই।'

'বুলশিট। মার খেতে যদি না চাও তা হলে দিয়ে দাও।'

ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে শাহিন বলল, 'সত্যি বলছি, নেই।'

'শোনো। আমি যদি তোমাকে মারি তা হলে অন্তত পাঁচদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। এই পাঁচদিন তোমার রোজগার বন্ধ থাকবে। শরীরে যন্ত্রণা হবে, খরচও হবে। দশ ডলার দিয়ে দিলে কত বেঁচে যাবে ভেবে দ্যাখো।' দয়ালু গলায় বলল লোকটা। পকেটে যা আছে সব নিয়ে নেবে লোকটা। শাহিন পকেটে হাত ঢোকাচ্ছে দেখে লোকটা হাত নামিয়ে নিয়েছিল। তখনই দৌড়াল সে। কিশোর বয়সে গাজির বিলের পাশ দিয়ে পলাশডাঙার মাঠ পেরিয়ে যেভাবে দৌড়োত তার চেয়ে অনেক দ্রুত বেগে দৌড়ে সিঁড়ির ধাপে পা দিল আজ। লোকটা চেঁচাতে চেঁচাতে পেছনে ছুটে আসছে। সে তরতর করে ওপরে উঠে রেস্টুরেন্টের দিকে যেতে যেতে টুক করে গ্রসারির দোকানে ঢুকে হাঁপাতে লাগল। লোকটা আসছে কিনা দেখার জন্যে অপেক্ষা না করে সে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে ডানদিকে তাকিয়ে খুশি হল। রেস্টুরেন্টের

কিচেনে ঢোকার পিছনের দরজাটা দেখা যাচ্ছে। দ্রুত তালা খুলে এবং বন্ধ করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল শাহিন।

জামাপ্যান্ট ছেড়ে ধাতস্থ হয়ে সে এক গ্লাস জল খেল। এরকম অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম হল। আকবর ভাইয়ের কাছে গল্প শুনেছে আমেরিকায় কিছু কালো মানুষ পাতালরেলের সুড়ঙ্গে, ম্যানহাটানে ভিক্ষে করার নামে ছিনতাই করে। তাদের নাকি কাজ দিলেও সেটা করতে চায় না। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং ধনী দেশের কিছু মানুষ সারা বছর এই করে বেড়ায়, ভাবা যায়? বাংলাদেশের মানুষ যতই গরিব হোক না কেন এভাবে জীবন কাটানোর কথা ভাবতেই পারবে না। শাহিনের মনে হল এদের তুলনায় দেশের মানুষ অনেক বেশি সভ্য।

লুকা বলল, 'ইউ আর লাকি।'

মালকিন বললেন, 'তোমাকে আমি আটকাব না। এখন তুমি চলে গেলে আমার খুব অসুবিধে হবে। কিন্তু যার বদলি হিসেবে তুমি কাজ করছ সে ফিরে এলে তোমাকে ছেড়ে দিতেই হত। তা ছাড়া ওখানে তুমি বেশি রোজগার করবে। পুলিশ যাতে তোমাকে না ধরে তার ব্যবস্থা দিয়াগো নিশ্চয়ই করবে। তার ওপর যেটা ঘটনা সেটা হল, তোমাকে না ছাড়লে দিয়াগো আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবে।'

'আপনি দিয়াগোকে ভয় পান?' হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল শাহিন।

'ও খুব বদমেজাজি, রুক্ষ। তবে এই রেস্টুরেন্ট করার সময় ও আমাকে খুব সাহায্য করেছে বলে আমি ওর সঙ্গে সংঘাতে যেতে চাই না।'

মালকিন তাকে বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে দিয়াগোর গ্যারেজে যেতে হবে। আবার পাতালরেলে উঠতে হবে শুনে মুখ শুকিয়ে গেল শাহিনের। সে গত রাতের ঘটনা মালকিনকে বলল। মালকিন বললেন, 'ওরা রাত না বাড়লে টানেলে আসে না। এখন দুপুরবেলা, কত লোক যাওয়া আসা করছে, এখন কোনও ভয় নেই।'

সুটকেস রেখে যেতে বললেন মালকিন। প্রয়োজনীয় জিনিস এবং আর একপ্রস্থ জামাপ্যান্ট একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে নিয়ে নিতে বললেন।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মালকিন বললেন, 'এই নাও। এখন পর্যন্ত যা কাজ করেছ তার জন্যে এটা তোমার প্রাপ্য।' মন খুব খারাপ হয়ে গেল শাহিনের। ভদ্রমহিলা যে এত ভাল তা সে আগে বুঝতে পারেনি। ওই ট্রাকে ঘোরার চাকরির বদলে সে যদি এখানেই থেকে যেতে পারত তা হলে অনেক বেশি ভাল লাগত। খামটা নিল সে। বলল, 'আমি আবার আসব।'

'নিশ্চয়ই। যখনই ট্রাক ফিরে আসবে আর তোমাকে পরের ট্রিপে না যাওয়া পর্যন্ত ছুটি দেবে তখনই চলে আসবে এখানে। তখন কাজ করতে পারো ইচ্ছে হলে, রাত্রে যেমন ছিলে তেমন থাকবে। তোমার সুটকেসটা তো রইলই।'

জো-এর মতো মোটা মানুষ আগে কখনও দেখেনি শাহিন। তার ওপর লোকটা বেশ বেঁটে। গ্যালিশ দেওয়া প্যান্ট পরেছে নইলে সেটা ঠিক জায়গায় থাকত না। মাথার পিছনদিকে খানিকটা চুল, সামনের দিকটা একদম পরিষ্কার।

দিয়াগো বলল, 'জো, এর কথা তোমাকে বলেছিলাম।'

'পাকিস্তানি?' জো চোখ ছোট করল।

'নো। হি ইজ ফ্রম বাংলাদেশ।'

'নট ইন্ডিয়া?'

'নো। ওর নাম শান। ওর জন্যে একটা আইডেন্টিটি কার্ড বানাতে বলেছিলাম লুথারকে। ব্যাটাকে দু'বার ফোন না করলে কোনও কাজ হয় না।' দিয়াগো গেল ফোন করতে। গ্যারাজের অফিসঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। শাহিন দেখল একটা বিশাল ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। এত বড় ট্রাক বাংলাদেশে দেখা যায় না।

জো বলল, 'শান, তুমি মিথ্যে কথা কেমন বলো?'

'আমি মিথ্যে বলি না।'

'চুরি করতে পারো?'

'না।'

'মেয়েমানুষ ভাল লাগে?'

কী উত্তর দেবে শাহিন ভেবে পেল না। জো বলল, 'কার করে না, বলো না! আর সবসময় মনে রেখো তুমি জেসাস নও যে সবসময় সত্যি বলবে, চুরি করবে না। ইউ আর হিউম্যান বিয়িং। এগুলো করতে হয়। তবে এমনভাবে করবে যাতে ধরা না পড়ো। ধরা পড়লে আই উইল কিক ইউ আউট। এবার কয়েকটা কথা বলি। যখন বাইরে যাবে তখন কাউকে বিশ্বাস করবে না। যে লোকটা ট্রাক চালাচ্ছে সে অফার করলেও চলন্ত ট্রাকে বসে মদ খাবে না। লোকটাকে সবসময় সন্দেহ করবে কিন্তু সেটা বুঝতে দেবে না। ড্রাইভার চেঞ্জ যখন হয় তখন ওরা হোটেলের সামনে ট্রাক দাঁড় করায়। ভুলেও তুমি হোটেলের ঘরে গিয়ে ঘুমোবে না। তুমি ট্রাকেই শুয়ে থাকবে। তোমাকে ডায়েরি লিখতে হবে না। মোবাইলে প্রত্যেকদিনের রিপোর্ট বলবে। সেটা ভয়েস রেকর্ডার রেকর্ড করে রাখবে। তোমাকে দুটো মোবাইল ফোন আমি দেব। একটা হাতে রাখবে, যেটা সবাই দেখবে। দ্বিতীয়টা এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবে যেন ওটার অস্তিত্ব কেউ জানতে না পারে। কারণ তোমার দেখতে পাওয়া মোবাইল যে-কোনও সময় হারিয়ে যেতে পারে। মোবাইল দুটোতে একটাই নাম্বার ফিক্স করা আছে, সেটা এই গ্যারাজের। আর হ্যাঁ, ড্রাইভারকে তো বটেই, কাউকেই খাওয়ানোর দায়িত্ব তোমার নেই। একমাত্র টয়লেটে যাওয়া ছাড়া ট্রাক ছেড়ে কোথাও যাবে না। আন্ডারস্ট্যান্ড?' বলেই বাঁ-হাতে ঘুষি চালাল জো, কোনওরকমে নিজেকে সরাতে পেরে আঘাত এড়াল শাহিন। জো বলল, 'শোনো এরকম সামান্য ব্যাপারে আমাকে ফোন করার দরকার নেই। যাও।'

এইসময় একটা লোক গ্যারাজে ঢুকে জো-এর সামনে চলে এল, 'জো, আমি যে সার্ভিস দিচ্ছি তা আর কেউ দেবে না। দেখে নাও।'

'কথাটা দিয়াগোকে গিয়ে বলো লুথার। ও ভেতরে আছে।' খামটা নিল জো।

'আমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে যায়নি। পরে দেখা হবে।' লুথার চলে গেল। জো শাহিনকে নিয়ে অফিসঘরে এল। দিয়াগো একটা ফাইলে কাগজ ভরছিল। জো বলল, 'লুথার ফিরে গেল। কে সই করবে?'

'তুমিই করে দাও।'

'ওকে বস।'

একটা মোটা পিজবোর্ডের ফোল্ডার খাম থেকে বের করে খুলে সই করে স্ট্যাম্প মেরে দিল জো। তারপর সেটা শাহিনের দিকে এগিয়ে ধরল, 'নাও। যত্ন করে রাখবে। যেখানে মাল ডেলিভারি করে তারা দেখতে চাইলে দেখাবে।'

শাহিন ফোল্ডার খুলে হতভম্ব হয়ে গেল। তার ছবি। পাসপোর্ট সাইজের। তলায় ইংরেজিতে লেখা শান হক। ছবিটার ওপর সেলোফেনের আস্তরণ পাকাপাকি বসানো। পাশে লেখা, ইউনাইটেড ক্যারিয়ার তাদের কর্মী শান হককে ট্রান্সপোর্টের কাজে নিযুক্ত করেছে। নীচে জো-এর সই এবং স্ট্যাম্প।

'আমার ছবি কোথায় পেলেন?' শাহিনের কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল।

ফাইলটা সাজিয়ে দিয়াগো বলল, 'তুমি যেদিন রেস্টুরেন্টে কাজের জন্যে এসেছিলে সেদিন দিদি তুলে রেখেছিল, টের পাওনি।'

'কিন্তু আমার নাম শাহিন। শান নয়।'

'নামে কিছু এসে যায় না। এখন থেকে তুমি শান। এদিকে এসে বসো।' এই ফাইলে যেসব কাগজ আছে তা তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ঠিক চারটের সময় ম্যাক এসে ট্রাকে বসবে। তার আগে সব বুঝে নাও।' টেবিলের উল্টোদিকে বসল দিয়াগো।

সাড়ে তিনটের মধ্যে সব বুঝে নিল শাহিন। খুব সোজা কাজ। যেখানে মাল নামাবে সেখানকার ম্যানেজারকে একটা কাগজ দিয়ে তার ডুপ্লিকেটে সই এবং স্ট্যাম্প মারাতে হবে। ফ্লোরিডায় যাওয়ার পথে মাত্র এক জায়গায় মাল নামাবে ট্রাক। ফ্লোরিডা থেকে ট্রাক বোঝাই করে মাল নিয়ে আসার সময় হিসেব করে কাগজ আনতে হবে। এই ক'দিনের খাওয়ার খরচ জো তাকে দিয়ে দিল।

সব শেষ হওয়ার পর শাহিন দিয়াগোকে জিজ্ঞাসা করল, 'পুলিশ যদি আবার আইডেন্টিটি জিজ্ঞাসা করে তা হলে এই কার্ড দেখাব?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু এটা তো পাসপোর্ট নয়।'

‘আমি কি পকেটে পাসপোর্ট নিয়ে ঘুরি? তুমি ইউনাইটেড ক্যারিয়ারের কর্মী। দ্যাটস এনাফ।’ দিয়াগো বলল।

‘আমি কি দুটো ফোন করতে পারি?’

‘গো অ্যাহেড।’ ফোন দেখিয়ে দিল দিয়াগো।

প্রথম ফোনটা সে করল আগের রেস্টুরেন্টে। মালিকের গলা পেল সে। ‘হ্যালো!’

‘আমি শাহিন।’

‘ও। কী খবর? সব ঠিক আছে?’

‘হ্যাঁ। আমি ওই রেস্টুরেন্টের চাকরিতে নেই। ট্রান্সপোর্টের চাকরিতে জয়েন করেছি।’

‘সর্বনাশ। তোমার জেলে যাওয়া কে ঠেকায়!’ মালিক চুকচুক শব্দ করল।

মন খারাপ হয়ে গেল শাহিনের। সে রিসিভার নামিয়ে রাখল। দিয়াগো তাকে মিথ্যে স্তোক দিচ্ছে না তো! জেলে গেলে কতদিন সেখানে থাকতে হবে তা কেউ তাকে বলতে পারেনি। দুই মাসও যদি থাকে তা হলে দেশে সে টাকা পাঠাতে পারবে না। আরও চিন্তায় পড়ে যাবে। নিশ্চয়ই ভাইকে বলবে খবর নিতে। আর তখনই ওরা জানতে পেরে যাবে সে জেলে আছে, খবরটা শুনলে আম্মু আর বাঁচবে না। মাথা নাড়ল সে। না, কিছুতেই জেলে যাবে না।

ওপাশ থেকে দিয়াগো চেঁচিয়ে বলল, ‘দুটো ফোন করবে বলেছিলে!’

ওদের দিকে একবার তাকিয়ে রিসিভার তুলল সে। বহুবার দেখে দেখে নম্বর মুখস্থ হয়ে গিয়েছে তার। এখন দেশে ক’টা বাজে। মনে মনে হিসেব করল। ভোর পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটা। আব্বু উঠে পড়ে, এর আগেই আম্মুও দিনের কাজ শুরু করে দেয় কিন্তু এ কী বলছে ফোনে? ‘যে নম্বরে আপনি কল করেছেন তা এই মুহূর্তে সুইচ অফ করা আছে। দয়া করে পরে ফোন করবেন।’ খুব রাগ হয়ে গেল ভায়ের ওপর। ফোন অফ করে রাখার কী দরকার ছিল!

ম্যাক এল ঠিক পনেরো মিনিট আগে। এসে ট্রাকটা পরীক্ষা করে নিল।

শাহিন দেখল লোকটাকে। অন্তত ছ'ফুট লম্বা। তেমনই স্বাস্থ্য। তবে ঘাড় বলে কিছু নেই। মাথাটাকে যেন কাঁধের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। জো তার সঙ্গে শাহিনের আলাপ করিয়ে দিল।

ম্যাক বলল, 'নেভার সিন বিফোর!'

জো বলল, 'হ্যাঁ। নতুন জয়েন করেছে। তুমি একটু বুঝিয়েসুঝিয়ে নিয়ো।'

ম্যাক শাহিনের কাঁধে হাত রাখল, 'ইউ গট এ নেম?'

'শান।' কার্ডের নামটাই উচ্চারণ করল শাহিন।

'সাউন্ড গুড। দে কল মি ম্যাক।' তারপর জো-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওকে সব কাগজপত্র দিয়েছ?'

'সব। শুধু গ্যাস কার্ড দেওয়া হয়নি। ওটা কি তুমি নেবে?'

'নো। সব ওকে দিয়ে দাও। লেটস গো শান!' ম্যাক ট্রাকের দিকে এগোল।

মাটি থেকে অনেক উঁচুতে দরজা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে সেটা খুলতে কসরত করতে হল। জো এবং দিয়াগো এসে দাঁড়িয়েছিল। দিয়াগো ওর হাত থেকে ফাইল আর প্যাকেট নিয়ে বলল, 'দু'বার ওঠানামা করলেই সহজ হয়ে যাবে।'

ওপরে উঠল শাহিন। ম্যাক তখন তার আসনে বসে গেছে। পাশেই আরও দু'জন বসতে পারে। ড্রাইভিং সিটের পিছনে একটা ছোট্ট ঘরের মতো জায়গা সেখানে লম্বা গদি মোড়া বেঞ্চ রয়েছে। দিয়াগোর কাছ থেকে জিনিসগুলো নিয়ে সেখানে রাখল সে। আন্দাজে বুঝল ওই ঘরেই তাকে ঘুমোতে হবে।

ট্রাক চলতে শুরু করলে দিয়াগো এবং জো হাত নাড়ল। ম্যাক স্টিয়ারিং-এ চাপড় মেরে বলল, 'হেই বয়, নো ট্রাবল। ওকে?'

শাহিন হেসে ফেলল। এই বিশাল চেহারার ট্রাকটাকে বয় বলছে ম্যাক। মনে হচ্ছে লোকটার মন ভাল। সে ম্যাকের কিছুটা দূরে বসে রাস্তা দেখতে শুরু করল। জো-এর দেওয়া মোবাইল দুটোর একটা তার হাতে, দ্বিতীয়টা জামাপ্যান্টের সঙ্গে প্যাকেটের মধ্যে।

'ইউ আর ফ্রম পাকিস্তান?' রাস্তায় চোখ রেখে ম্যাক জিজ্ঞাসা করল।'

'তোমার আমাকে পাকিস্তানি কেন মনে হচ্ছে?'

'আমি ওদের কাউকে কাউকে চিনি। তোমার মতো দেখতে তারা।'

'না। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। বাঙালি।'

নিউইয়র্ক শহরের মধ্যে দিয়ে ট্রাক চলছিল। খুব দ্রুত বেরিয়ে এল ফাঁকা রাস্তায়।

'এনি আইডিয়া অ্যাবাউট ফ্লোরিডা?'

'না।'

'বিগ সিটি ইজ মায়ামি। বাট উই আর গোয়িং টু পম্পানো। পম্পানো জানো?'

'না।'

'ওয়েল। অ্যাটলান্টিকের পাশে একটা শহর। সি-বিচ। গুড সিটি।'

'তুমি কি পম্পানো পর্যন্ত যাবে?'

'প্রায় হাজার মাইল। নন স্টপ গেলে পনেরো ঘণ্টা। সেটা কেউ যায় না। রাত্রে পাঁচ ঘণ্টা ঘুমোব। ধরো বাইশ ঘণ্টা লাগবে উইথ ব্রেক। জো-কে বলেছি যখন বিশ্রাম নিতে পারব তখন পম্পানো পর্যন্ত ট্রাকটাকে চালিয়ে নিয়ে যাব। ওখান থেকে ড্রাইভার চেঞ্জ হবে।'

শাহিন দেখল একটা বিরাট নদীর ওপর ব্রিজ, ট্রাক সেটা পেরোচ্ছে।

তখনই ফোন বেজে উঠল। বোতাম টিপে হ্যালো বলল শাহিন। জো-এর গলা, 'ঠিকঠাক আছে সব?'

'হ্যাঁ।'

'নদী পার হয়েছ?'

'এই হচ্ছি।'

'হ্যাভ এ নাইস জার্নি। বাই।' লাইন কেটে দিল জো।

'শান, তুমি তোমার যা কাজ তা নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছ? ম্যাক তাকাল।

'হ্যাঁ।'

'তোমার সবচেয়ে জরুরি কাজ কী বলো তো?'

বুঝতে না পেরে শাহিন তাকাল ম্যাকের দিকে।

'স্পায়িং। আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করা। আমি কখন কী করছি তার রিপোর্ট জো-কে দিতে হবে তোমাকে। নর্থ ক্যারোলিনা বলে শহরে কিছু মাল নামাতে হবে। তখন কোম্পানিকে না জানিয়ে পম্পানো বা অন্য কোথাও ডেলিভারি দেওয়ার জন্যে আমি মাল তুলছি কিনা তা তোমাকে লক্ষ রাখতে হবে। কেউ আমাকে ড্রাগ পৌঁছে দেওয়ার জন্যে দিচ্ছে কিনা,তাও তোমাকে দেখতে হবে। ট্রাক চালাবার সময় আমি ড্রিঙ্ক করছি কিনা সেটা ওদের জানাতে হবে। মজার কথা হল, এর সবগুলো আমি করতে পারি যার কোনওটাই তুমি টের পাবে না।' হা-হা শব্দে হাসল ম্যাক।

সামনে গাড়ির লাইন পড়েছে। অনেক ওপরে থাকায় শাহিন দেখতে পেল রাস্তাজুড়ে খাঁচা এবং খাঁচার গায়ে বাক্সে লোক বসে আছে। গাড়ির ড্রাইভার হাত বাড়িয়ে কিছু দিলে চলে যাওয়ার অনুমতি মিলছে।

ওদের ট্রাক যখন খাঁচার সামনে এল তখন ম্যাক হাত বাড়িয়ে একটা কার্ড এগিয়ে দিল। খাঁচার ভেতরে বসা লোকটা সেই কার্ড পাঞ্চ করে ফেরত দিতে সামনের ব্যারিকেড উঠে গেল। ট্রাক নিয়ে আবার হাইওয়েতে চলে এল ম্যাক।

'তোমাদের দেশের রাস্তা কেমন?' ম্যাক জিজ্ঞাসা করল।

'ভাল।'

'নিশ্চয়ই টোল আদায় করে?'

'টোল?'

'টোল ট্যাক্স! এই যে দিয়ে এলাম।'

'না।'

'সে কী! তা হলে রাস্তা ঠিক রাখে কাদের পয়সায়? ফ্লোরিডায় যেতে তো অনেকবার কার্ড পাঞ্চ করাতে হবে।' ম্যাক বিড়বিড় করল।

এখন দু'পাশে খোলা মাঠ, গাছগাছালি। বিশাল হাইওয়ে ধরে গাড়ি ছুটছে ওপাশ-ওপাশে। শাহিন গুনল দু'দিকে চারটে করে মোট আটটা লেন। একটা গাড়ির থেকে অন্যটির ব্যবধান দশ গজের বেশি নয়। মাঝে মাঝেই কতটা স্পিডে গাড়ি চলবে তার নির্দেশ রাস্তার পাশের বোর্ডে দেওয়া আছে। বারবার পঞ্চান্ন শব্দটা চোখে পড়ছিল।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'সবাই কি পঞ্চান্ন স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে?'

'যে চালাবে না তার বারোটা বাজবে। রাস্তায় ক্যামেরা চলছে। পুলিশ তাতে নজর রাখছে। আইন ভাঙলেই ছুটে আসবে আড়াল থেকে।'

চারপাশে ভাল করে লক্ষ করেও কোন পুলিশকে দেখতে পেল না শাহিন।

ঘণ্টা দুয়েক চলে গেলে খেয়াল হল ওর। সে তো ইতিমধ্যে আট ডলার রোজগার করে ফেলেছে। ঘণ্টায় চার ডলার হলে তাই তো হয়। কোনও কাজ না করে, আরাম করে বসে রোজগারটা হয়ে গেল। দেশের টাকায় পাঁচশো ষাট টাকা!

'ঘণ্টা তিনেক যাওয়ার পর ম্যাক জিজ্ঞাসা করল, 'খিদে পেয়েছে?'

'না।'

'আমার পেয়েছে।' বলে একজিট লেখা একটা রাস্তায় নেমে পড়ল হাইওয়ে ছেড়ে। খানিকটা যাওয়ার পর বাঁক ঘুরতে অবাক হয়ে গেল শাহিন। প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে একটা নির্জন জায়গায়। ওপাশের বাড়িটা যে রেস্টুরেন্ট তা বোঝা যাচ্ছে। ট্রাক পার্ক করে নেমে গেল ম্যাক। একটু ভাবল সে। তাকে বলা হয়েছে টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন না হলে ট্রাক ছেড়ে না যেতে। সে মোবাইলের বোতাম টিপতেই ওপাশে রিং হল। তারপর জো-এর গলা, 'ইয়েস মাই বয়!'

শাহিন তাকে জানাল ম্যাক হাইওয়ে ছেড়ে একটা খাবারের জায়গায় ট্রাক দাঁড় করিয়েছে। জায়গাটার নাম সে ট্রাকে বসে জানতে পারেনি। সে কি নীচে নামতে পারে?

জো বলল, 'শোনো, এরকম সামান্য ব্যাপারে আমাকে ফোন করার দরকার নেই। যাও।'

ফোন পকেটে নিয়ে নীচে নামল শাহিন। তারপর গাড়ির ফাঁক দিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকল। এটা একটা ফাস্টফুডের দোকান। চা-কফি ছাড়াও প্যাকেটের খাবার বিক্রি হচ্ছে। সে টয়লেট দেখতে পেয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই তার কান খাড়া হল। একটা লোক গুনগুন করে গান গাইছে, 'ধনধান্যপুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা...'। মাঝে

মাঝে স্পষ্ট হচ্ছে কথাগুলো, মাঝে মাঝে সুর শোনা যাচ্ছে।

সে লোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি বাঙালি?'

'অবশ্যই। কেন?'

'আপনি বাংলা গান গাইছেন শুনে বুঝতে পারলাম।'

'আমার চেহারা খুব ডিসিভিং। লোককে ভুলে বোঝায়। কোথায় দেশ?'

'ফরিদপুর।'

'আচ্ছা! আমি যশোর। আমি ডক্টর পলাশ ইসলাম।'

'আমি শাহিন। আপনি কি ডাক্তার?'

'হ্যাঁ ভাই। আঠারো বছর আছি এ দেশে। কিন্তু সকল দেশের সেরা হল আমার জন্মভূমি। বাংলাদেশ।'

'আপনি যখন ডাক্তার তখন নিশ্চয়ই এ দেশে থাকার বৈধ কাগজ আছে?'

'আরে! আমি একজন আমেরিকান সিটিজেন। ডাক্তারি পড়তে এসে আর ফিরে যাইনি। গ্রিন কার্ড পেলাম, এখন পাসপোর্ট। থাকি বাল্টিমোরে। যাচ্ছি নিউইয়র্ক।'

পকেট থেকে কার্ড বের করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'শাহিন ভাই, করেন কী?'

'ট্রান্সপোর্টে কাজ করি।'

'গুড। নিউইয়র্ক শিকাগোতে অর্ধেক ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাদের দেশের। তা চললেন কোথায়?'

'ফ্লোরিডায়।'

'চলুন, আপনাকে কফি খাওয়াই।'

'না না। আমার দেরি হয়ে যাবে।'

'ওকে! তা হলে ওই গানটা আমার সঙ্গে দু'লাইন গান।' চোখ বন্ধ করলেন ডক্টর ইসলাম, 'ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, গান ভাই, গলা মেলান।'

শাহিন গলা মেলাল যখন ডক্টর গাইলেন, 'মাগো তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি, আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই

মরি' গাইতে গিয়ে চোখে জল এসে গেল তার। আম্মুর কান্না মনে পড়ে যেতেই গলা বুজে গেল। ডক্টর ওর কাঁধে হাত রাখলেন, 'শাবাশ। যতদিন চোখে পানি আসবে, বুকে কান্না বাজবে দেশের জন্যে, ততদিন আপনি আমি খাঁটি বাংলাদেশের বাঙালি থাকব। এই আমেরিকা তার কাছে তুচ্ছ। সময় পেলে কল দেবেন।'

ট্রাকের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে শাহিন দেখল ম্যাক একটা হটডগ আর বিয়ার খাচ্ছে।

গানটার জন্যে মন এত ভারী হয়ে গিয়েছিল যে ম্যাকের বিয়ার খাওয়াটাকে উপেক্ষা করল সে। ম্যাক ক্যানটা ওর দিকে এগিয়ে দিলে সে মাথা নাড়ল, না।

'তুমি বিয়ার খাও না?' ম্যাক জিজ্ঞাসা করল।

'গাড়িতে বসে মদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে।' শাহিন বলল।

হো হো করে হেসে উঠল ম্যাক। তারপর এক চুমুকে ক্যান শেষ করে বলল, 'তুমি বিয়ারকে মদ বলো বুঝি! ইন্টারেস্টিং। বিয়ার আর জলের মধ্যে তফাত খুব সামান্য। এরকম ক্যান দশটা খেলেও আমার নেশা হবে না।'

ট্রাক আবার উঠল হাইওয়েতে। এতক্ষণে সিডি চালাল ম্যাক। খুব জোরে প্রচণ্ড বাজনার সঙ্গে ইংরেজি গান গাইছে একজন পুরুষ। ম্যাক তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্টিয়ারিং-এ তাল ঠুকছে। লোকটাকে মাঝে মাঝে ভাল লাগছিল শাহিনের।

আমেরিকায় এই সময় রাত নামে অনেক দেরিতে। হাইওয়ের গাড়িগুলো আলো জ্বালায় রাত সাড়ে আটটার পরে। শাহিন লক্ষ করছিল মাইলের পর মাইল কোনও ঘরবাড়ি নেই। এমনকী গাছপালা, পুকুর, নদীও চোখে পড়ছিল না। শুধু ন্যাড়া মাঠ। যাদের দিকে তাকালে চোখের তো আরামই হয় না, উলটে একঘেয়েমি চেপে বসে। ঘুম পায়।

'বিয়ে করেছ?' গাড়ি চালাতে চালাতে ম্যাক প্রশ্ন করল।

'না।' দ্রুত মাথা নাড়ল শাহিন।

'গার্ল ফ্রেন্ড?'

'না।'

চুক চুক শব্দ করল ম্যাক। তারপর বলল, 'শোনো, বুদ্ধিমানরা গার্ল ফ্রেন্ড রাখে, বোকারা তাদের বিয়ে করে। বিয়ের দশ বছর পরে বেশিরভাগ পুরুষ অবিবাহিতের জীবন-যাপন করে। এই যেমন আমি। তোমার যদি ঘুম পেয়ে থাকে তা হলে পিছনে গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমার পাশে বসে ঢুলবে না। বুঝতে পেরেছ?'

'না না ঘুম পায়নি।' সোজা হয়ে বসল শাহিন।

মাঝে মাঝে রাস্তার ওপরের সুন্দর বোর্ড জানিয়ে দিচ্ছিল কোন শহর কত দূরে। প্রথম দিকে খেয়াল করছিল শাহিন, পরে আর নজর দেয়নি। হঠাৎ গাড়ির গতি কমে যেতে সে দেখল হাইওয়ে ছেড়ে একজিট দিয়ে গাড়ি চলছে। একটু বাদেই একটা আধাঘুমন্ত শহরে ঢুকে গেল তারা। রাস্তায় জনমানব নেই। ফাঁকা জায়গা মাঝখানে রেখে বাড়িগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা যাওয়ার পর রাস্তা ছেড়ে লম্বা ব্যারাক গোছের বাড়ির বাঁধানো চত্বরে ঢুকে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি। ম্যাক বলল, 'ওকে। আমরা রুলে পৌঁছে গিয়েছি! রুলে-নর্থ ক্যারোলিনা। এই বাড়িটা একটা হোটেল। তুমি তো গাড়িতেই শোবে। আমি রাতটার জন্য ঘর নেব। খিদে পেলে ওদিকে যেয়ো, রেস্টুরেন্ট আছে।' ম্যাক নেমে পড়ল নীচে। শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করতেই মোটেলের একতলার ঘরের একটার দরজা খুলে গেল। শাহিন দেখল একটা লম্বা মেয়ে যার পরনে খাটো প্যান্ট আর হাত কাটা গেঞ্জি বারান্দায় চলে এসে হাত নাড়ল, 'হাই!'

ম্যাক সেদিকে না তাকিয়ে হাই বলে উলটোদিকে চলে গেল। এখান থেকে যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে মেয়েটি বেশ সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী। এখন মধ্যরাত। মেয়েটা কি জানত ম্যাক এই সময় ট্রাক নিয়ে আসবে! জানত বলেই জেগে আছে? তা হলে ম্যাক ওকে পাত্তা না দিয়ে চলে গেল কেন? মেয়েটা এখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুলে হাত বোলাচ্ছে আর ম্যাক যেদিকে গেল সেদিকে তাকাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে খিদে পাচ্ছিল, গাড়ি থামতে সেটা চাগাড় দিল। দরজা খুলে নীচে নামল সে। মেয়েটা তাকে অবাক হয়ে দেখছে। ম্যাক

যেদিকে রেস্টুরেন্ট আছে বলেছিল সেদিকে এগোতেই মেয়েটা গলা তুলে বলল, 'হাই।'

চোখ ফেরাল শাহিন। মেয়েটা নীচে নেমে এল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'রেস্টুরেন্টে।' গলা কেঁপে গেল শাহিনের। অসম্ভব সুন্দরী মেয়েটা।

'ওকে! খেয়ে দেয়ে যখন আসবে তখন একটা চকোশেক নিয়ে আসবে আমার জন্যে। আমি সাত নম্বর রুমে আছি। আমার সঙ্গে থাকলে তোমাকে রাতের জন্যে আলাদা ঘরভাড়া করতে হবে না। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। তাড়াতাড়ি চলে এসো।' বলে মিষ্টি হেসে মেয়েটি সাত নম্বর ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল।

সমস্ত শরীর শিরশিরিয়ে উঠল। এতদিন সে আমেরিকায় আছে কিন্তু কোনও সাদা মেয়ে তাকে ঘরে ডাকেনি। যদিও তার ঘরভাড়া করার দরকার নেই, ট্রাকেই থাকবে, তবু মেয়েটা কী সহানুভূতি দেখাল। হাঁটতে হাঁটতে শাহিন আবিষ্কার করল, আজ পর্যন্ত কোনও মেয়ে তাকে বলেনি, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।

রেস্টুরেন্টটা ছোট্ট। একটা চিকেনবার্গার আর কোক নিয়ে টেবিলের দিকে তাকাতেই ম্যাককে দেখতে পেল সে। ম্যাকের সামনে তখন খাওয়া এবং না খাওয়া খাবারের স্তূপ। ওকে বসতে বলে ম্যাক জিজ্ঞাসা করল, 'ওইটুকুতে হবে? তোমার পেটের খোল কত ছোট?'

'এত রাত্রে বেশি খাব না।' চিকেনবার্গার মুখে তুলল শাহিন।

'আমরা কাল আটটা নাগাদ বেরিয়ে যাব। যাওয়ার সময় কিছু ডেলিভারি দেওয়ার আছে। এখন একটা। ছ'-সাত ঘণ্টা ঘুম তো অনেকটা।' ম্যাক বলল।

বাংলায় বললে আপনি বলতে হত, কিন্তু ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দে তুমি বলা যায়। শাহিন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ঘর পেয়ে গেছ?'

'হ্যাঁ। এগারো নম্বর। কেন?'

'এমনি। যদি রাত্রে দরকার হয়।'

'মাঝে মাঝে পুলিশ এসে চেক করে, তা ছাড়া আর কোনও কারণে দরকার হবে না। দরজা ভিতর থেকে লক করে শোবে। আর হ্যাঁ, তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ, একটা মেয়ে আমাকে হাই বলছিল গাড়ি থেকে নামার

পরে, তাকে একদম পাত্তা দেবে না। ও যদি গিয়ে তোমাকে ডাকাডাকি করে তা হলে সাড়া দেবে না। মনে থাকে যেন!'

'কেন?' অবাক হয়ে গেল শাহিন।

'ও নিজে পেশেন্ট নয় কিন্তু ক্যারিয়ার।'

'কীসের?'

'এডস!'

হাঁ হয়ে গেল শাহিন। অত সুন্দরী মেয়ে—!

'পুলিশ এসে মাঝে মাঝে ধরে নিয়ে যায়, কিন্তু আটকে রাখতে পারে না। সেই আইন নাকি নেই। মোটেলের ম্যানেজার বলে কেউ ওর বিরুদ্ধে কমপ্লেন না করে তা হলে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়। বেচারাকে রোজ অন্তত সত্তর আশি ডলার রোজগার করতেই হবে। ঘর ভাড়া, খাওয়া, পোশাক, ড্রিঙ্কস, খরচ কম তো নয়। পেয়েও যায়। একটু পরেই দেখবে ট্রাকের পর ট্রাক আসবে।' ম্যাক খাওয়া শেষ করল।

'কিন্তু তাদের তো ভয়ংকর অসুখটা হয়ে যাবে।'

ম্যাক উত্তর না দিয়ে ট্রে তুলে নিয়ে দূরের বাক্সে ফেলে বেরিয়ে গেল। মন খারাপ হয়ে গেল শাহিনের। মেয়েটা একটা চকোশেক চেয়েছে তার কাছে। কাউন্টারের পেছনে টাঙানো মেনুবোর্ডে সে দেখেছে চকোশেকের দাম দু'ডলার পঁচিশ সেন্ট। দেশের টাকায় দেড়শো টাকার ওপরে। ম্যাকের মুখে ওসব না শুনলে সে ওটা কিনে দিত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে গ্রামের অনেক মানুষ সারাদিনে ওই টাকা রোজগার করেন না।

টয়লেট সেরে গাড়িতে ফিরে এল শাহিন। যতটা পারে কম আওয়াজ করে দরজা বন্ধ করল। দুটো দরজা ভেতর থেকে আটকে দিয়ে পিছনের লম্বা গদিমোড়া বেঞ্চে শরীর এলিয়ে দিয়ে বেশ আরামবোধ করল। বাইরের আলো ভেতরে ঢুকছে না, ঘুম এসে গেল ঝটপট।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল শাহিন জানে না, সাইরেনের শব্দে সেটা ভেঙে যেতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে। বসেই দেখতে পেল গোটা চারেক ছোট-বড় ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে দু'পাশে। সাইরেনটা এগিয়ে আসছে। এবং তারপরেই দু'-দুটো মাথায় আলোজ্বলা পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল

মোটেলের সামনে। চারজন পুলিশ অফিসার তাদের গাড়ি থেকে নেমে ট্রাকগুলোকে দেখতেই শাহিন মাথা নিচু করল। বুকের ভেতর ড্রাম বাজছে এখন, ওকে দেখতে পেলেই ওরা ধরে জেলে চালান করে দেবে। এ দেশে তাকে বাঁচানোর কেউ নেই।

দরজায় আওয়াজ হচ্ছে। মাথা তুলল সে। ট্রাকের ভেতরটা অন্ধকারে ঢাকা, ওঁদের পক্ষে দেখা অসম্ভব, তবু সে বেশি সাহসী হল না। প্রথমে যে দরজাটা খুলল তার সামনে দাঁড়ানো অফিসারদের একজনের হাতে রিভলভার। যে লোক দুটো বের হল তাদের উচ্চতা সাড়ে ছ'ফুটের নীচে নয়। তেমনই চওড়া। একজন অফিসার কিছু বলতে দু'জনেই বাধ্য ছেলের মতো ভেতরে ঢুকে কিছু নিয়ে এসে অফিসারকে দিল। বোধহয় ড্রাইভিং লাইসেন্স অথবা পরিচিতির কাগজ। পরীক্ষা করার পর তাদের ছেড়ে পরের দরজার দিকে এগোল অফিসাররা। লোক দুটো দরজা বন্ধ করে দিল। ইতিমধ্যে অন্য দুই অফিসার যে ঘরের দরজায় আওয়াজ করছে সেটা এগারো নম্বর ঘর। ম্যাককে বের হতে দেখল শাহিন। পরনে শর্টস, গেঞ্জি। অফিসার তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে ট্রাকটাকে দেখাল। অফিসার আবার কিছু বলতে ম্যাক ট্রাকের দিকে এগিয়ে আসছিল, পেছনে একজন অফিসার। শাহিন বুঝতে পারছিল না ম্যাক কেন ট্রাকের দিকে আসছে? অফিসার কি তার কথা ওকে জিজ্ঞাসা করেছে? এখন এখান থেকে পালাবার উপায় নেই। হঠাৎ কী মনে হতে সে ম্যাকের দরজার বন্ধ ছিটকিনিটা খুলে দ্রুত পেছনে চলে এল। প্রায় তখনই দরজা খোলার শব্দ হল। বিড়বিড় করে কিছু বলতে বলতে ম্যাক ওপরে উঠে গাড়ির ড্রয়ার থেকে একটা ফোল্ডার বের করে নীচে দাঁড়ানো অফিসারের হাতে দিল। কয়েক সেকেন্ড সেটাকে পরীক্ষা করে ওটা ফেরত দিয়ে অফিসার চলে গেল বারান্দার দিকে। ফোল্ডার ড্রয়ারে রাখতে রাখতে ম্যাক জিজ্ঞাসা করল।

'তুমি কি জেগে আছ?'

'হ্যাঁ।'

'ভাগ্যিস দরজার ছিটকিনি লাগাওনি।'

'লাগিয়েছিলাম। তোমাকে এদিকে আসতে দেখে খুলে দিলাম।'

‘ওঃ মাই গড। তার কোনও দরকার নেই। গুড নাইট।’ ম্যাক নেমে গেল। এবার চাবি ঘোরানোর আওয়াজ টের পেল শাহিন।

এইসময় সাত নম্বর ঘরের দরজা খোলাল পুলিশ অফিসার। শাহিন দেখতে পেল মেয়েটাকে। চুল ঠিক করতে করতে বেরিয়ে আসছে। অফিসার তাকে যত প্রশ্ন করতে লাগল তত মাথা নেড়ে না বলতে লাগল মেয়েটা। তারপর শব্দ করে হাই তুলল যেন খুব ঘুম পেয়ে গেছে। এবার দ্বিতীয় অফিসারটি অন্ধকার ঘরে টর্চের আলো ফেলল। তারপর বলল, ‘শি ইজ ওকে। স্লেপ্ট অ্যালোন!’

প্রথম অফিসার মাথা নাড়ল, ‘তবু ভেতরে গিয়ে দেখে এসো।’

মেয়েটি চিৎকার করল, ‘বিলিভ মি, বিলিভ মি!’

তবু দ্বিতীয় অফিসার ভেতরে ঢুকল। এবার ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুই অফিসার ছুটে গেল সেখানে। একটু পরে একটা আন্ডারওয়ার আর গেঞ্জি পরা বিশাল চেহারার নিগ্রোকে দুই হাতে হাতকড়া পরিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে বারান্দায় বের করে নিয়ে এল ওরা। মেয়েটা টুক করে ভেতরে ঢুকে গেল। অফিসার চিৎকার করতে সে বেরিয়ে এল একটা জ্যাকেট পরে, হাতে প্যান্ট-শার্ট। সেই দুটো হাতকড়া পরা লোকটির কাঁধে ছুড়ে দিয়ে মেয়েটা বলল, ‘লেটস গো।’

দু’জনকে দুটো গাড়িতে তুলে চারজন অফিসার বেরিয়ে গেল মোটেল থেকে। এখন এখানে সব চুপচাপ। দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল শাহিনের। ভাগ্যিস ম্যাক তাকে কথাগুলো বলেছিল। নইলে সে নেহাত সৌজন্যবশত চকোশেক কিনে মেয়েটাকে দিতে যেত ওর ঘরে। হয়তো গল্প করত। হয়তো—! তারপর পুলিশ এসে তাকে ধরত। নিয়ে যেত থানায়। আবিষ্কার করত এ দেশে থাকার বৈধ কাগজপত্র তার নেই। আবার সে যদি মেয়েটির ঘরে না গিয়ে রাত্রে শোওয়ার জন্য হোটেলের এই একতলার কোনও ঘর ভাড়া নিত তা হলে তার কাছেও পুলিশ আইডেন্টিটি কার্ড দেখতে চাইত। জো-দের দেওয়া কার্ডে কতখানি কাজ হত তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে তার। এই ট্রাকের কেবিনে থাকার জন্যে জোর বেঁচে গেছে আজ।

ঘুম ভেঙে যেতে শাহিন বুঝল ট্রাক চলছে। ম্যাক তাকে না জাগিয়ে আবার চলা শুরু করেছে। সে উঠে সামনের কেবিনে এসে দেখল ঘড়িতে এখন আটটা চার। ম্যাক বলল, 'গুড মর্নিং! কেমন ঘুম হল?'

'গুড মর্নিং। ঠিক আছি।'

'আমি তো ঘুমাতেই পারলাম না। পাঁচটা নাগাদ ফিরে এল মেয়েটা। এসে নিজের ঘরে ঢোকেনি। কোথাও লুকিয়ে ছিল। তার কিছু পরে এল ওর রুমমেট। এসে চিৎকার করতে লাগল। ওর ওয়ালেটে দুশো ডলার ছিল। মেয়েটা নাকি তা মেরে দিয়েছে। বেচারা আর কী করবে! ওকে যখন বলা হল আজই কোনও ডাক্তারের কাছে যেতে কারণ মেয়েটার এডস আছে তখন এমন ঘাবড়ে গেল যে তাড়াতাড়ি তার ট্রাকে উঠে চলে গেল। মনে হল, এখান থেকে পালাতে পারলে যেন বাঁচে।'

'ওদের পুলিশ ছেড়ে দিল?'

'কী করবে? বড় কোনও কেস দিতে পারবে না তো।'

'মেয়েটা যে এভাবে রোগ ছড়াচ্ছে?'

'এটা অবশ্যই একটা পয়েন্ট। কিন্তু তার দায়িত্ব মোটেলের মালিকের। সে কী কারণে মেয়েটাকে তাড়াবে? ঠিকঠাক ভাড়া দিচ্ছে, মেয়েটার বিরুদ্ধে কোনও কমপ্লেন নেই। তাড়াতে চাইলে মেয়েটাই ওর বিরুদ্ধে মামলা করবে।'

'কিন্তু এই যে ও লোকটার দুশো ডলার চুরি করল, ওটা তো অপরাধ!'

'অবশ্যই। কিন্তু তার জন্যে পুলিশের কাছে গিয়ে লোকটাকে নালিশ জানাতে হবে। ও তো জানতে পারল ঘরে এসে, ওয়ালেট পাওয়ার পর। দুশো ডলার ফিরে পাওয়ার জন্যে পুলিশের কাছে এই অবস্থায় ও কখনও যেতে পারে?'

একটু পরেই একটা বড় গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল ম্যাক। গেট খুলে গেলে ভেতরে ঢোকাল গাড়ি। নীচে নামার আগে ম্যাক বলল, 'তোমার কাগজপত্র নিয়ে এসো। এখানে যা যা নামবে তা কাগজ দেখে সইসাবুদ করিয়ে নাও।'

পরের পঞ্চাশ মিনিট প্রচণ্ড ব্যস্ততায় কাটল শাহিনের। বিশাল

ট্রাকের পিছনের দরজা খুলে গুদামের লোক চিহ্ন দেখে বাক্সগুলো নীচে নামাচ্ছিল। সেগুলো ভাল করে দেখে কাগজে নোট করছিল শাহিন। জীবনে প্রথমবার এই কাজটা করতে গিয়ে তার কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। সে প্রথম ফোনের বোতাম টিপতেই জো-এর গলা পেল। জো জিজ্ঞাসা করল। 'রুলে-তে পৌঁছে গেছ?'

'হ্যাঁ। কাল রাত্রে এসেছি। ম্যাক একটা হোটেলে ট্রাক রেখেছিল। আমি ট্রাকের কেবিনে ঘুমিয়েছি। এখন প্রথম গুদামে মাল নামানো হচ্ছে।'

'ক'টা নামিয়েছে?'

'সাতটা।'

'গুড। দেখবে একটা বাক্সর ওপর কোনও নম্বর নেই। সেটাও নামিয়ে দেবে।'

'তা হলে মোট আটটা হবে। কিন্তু চালানে সাতটা লেখা আছে।'

'জানি। ওরা সাতটা পাচ্ছে বলে সই করবে। পাবে আটটা। আমি একটু আগে ওদের মালিকের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি।' জো ফোন রেখে দিল।

তাই করা হল। নম্বর ছাড়া বাক্সটা নিয়ে ওরা আগে ভেতরে চলে গেল, চালানে সই স্ট্যাম্প করার পর ম্যাক ফিরে এসে বলল, 'জো-কে বলো ওরা চারটে বাক্স পম্পানো বিচে পাঠাতে চাইছে। সে রাজি আছে কি না?'

আবার ফোন করল শাহিন। জো বলল, 'ওদের বলো কাগজপত্র ঠিকঠাক তৈরি করে যেন ট্রাকে লোড করে। আর এই অ্যাসাইনমেন্টের পেমেন্ট সঙ্গে সঙ্গে চেকে দিতে হবে।'

ম্যাককে বলতে সে হেসে বলল, 'ওকে। যাও, সকাল থেকে কিছু খাওনি, ভেতরে ক্যান্টিন আছে, পনেরো মিনিটের মধ্যে যা খাওয়ার খেয়ে এসো।'

ট্রাক চলছিল হাইওয়ে দিয়ে। শাহিন লক্ষ করল, দূরে সবুজ গাছগাছালি দেখা যাচ্ছে। এই দেশের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক অনেক সুন্দর।

শহরের বাইরে পা দিলেই চোখ জুড়িয়ে যায় সবুজ দেখে। সেটা গাছের পাতাই হোক বা চাষের খেত হোক। আর জল। বাংলাদেশের মতো জল এখানে কোথায়?

ম্যাক বলল, 'তুমি খুব সরল লোক!'

অবাক হল শাহিন। হঠাৎ এ কথা বলছে কেন?

'এই যে এখান থেকে লরিতে মাল উঠল, ওরা তোমাকে কাগজ তৈরি করে দিল কিন্তু তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেখলে না। ওদের বিশ্বাস করলে!'

'তুমি তো বললে চা খেয়ে আসতে।'

'চেক করার পর যেতে পারতে। তোমাকে এখানে ফেলে আমি তো ট্রাক নিয়ে চলে যেতে পারতাম না।'

'তুমি তো ছিলে। দ্যাখোনি?'

'আরে আমি তো বাইরের লোক। কোম্পানির লাভ ক্ষতি নিয়ে আমি মাথা ঘামাব কেন? আমি রোজের টাকা পেলেই খুশি।'

'জো কে বলেছি ওরা চারটে বাক্স তুলবে। ক'টা তুলেছে?'

'আমি দেখিনি', মাথা নাড়ল ম্যাক, 'কী করে বলব!'

শাহিন বুঝতে পারল ম্যাক সত্যি কথা বলছে না। ঠিক তখনই ফোন বেজে উঠল। অন করতে জো-এর গলা কানে এল, 'কোথায়?'

'পম্পানো বিচ-এর দিকে যাচ্ছি।'

'নতুন বাক্স ট্রাকে উঠেছে?'

'হ্যাঁ।'

'ক'টা?'

ঢোঁক গিলল শাহিন, 'চারটে।'

'গুড।' লাইন কেটে দিল জো।

ম্যাক হাসল, 'যদি চারটের বেশি হয় তা হলে তুমি জো-কে মিথ্যে বললে, জো যদি সেটা জানতে পারে তা হলে তোমার চাকরি খতম।'

গম্ভীর হয়ে গেল শাহিন। এই চাকরিটা খতম হোক সে চায় না। এতদিন রেস্টুরেন্টের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকতে হত তাকে। বাইরে বের হলেই মনে হত এই পুলিশ তাকে ধরল। আর এই

চাকরিতে তার দু'পাশে নীল আকাশ, মাঠ, অঢেল হাওয়া; সামনে চার লেনের হাইওয়ে। সে যদি কোনও অন্যায় না করে তা হলে পুলিশ তাকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবে না। আসলে পুলিশ ভালভাবে জানে নামে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট হলেও বেশিরভাগই বাংলাদেশি মালিকানায় চলে এবং তারা সস্তায় কর্মচারী খোঁজে বলে পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়া মানুষ খোঁজে। এইসব রেস্টুরেন্টে হানা দিলেই মামলা তৈরি করতে পারা যায়। মুশকিল হল, হানা দিতে আরম্ভ করলে দেশের সব ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর এক ঝামেলা। তাই ওরা বেছে বেছে হানা দেয়। শাহিনের নাম যেহেতু কম্পিউটারের লিস্টে উঠে গেছে তাই ওকে খোঁজার একটা চেষ্টা কিছুদিন চালাতে হবে। সে তুলনায় ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায় পুলিশ বে-আইনি লোক খুঁজতে বড় একটা আসবে না।

পম্পানো বিচে ঢোকার মুখেই নির্দিষ্ট গুদামে যখন মাল নামানো হচ্ছিল তখন সেদিকে শকুনের মতো তাকিয়ে থাকল শাহিন। তিনবার গোনার পর সে নিঃসন্দেহ হল, চারটে নয়, সাতটা বাক্স রুলে থেকে ট্রাকে উঠেছে। অথচ ওরা চারটে তুলেছে বলে চালানে লিখেছে। সে তিনটে বাক্স ট্রাক থেকে নামাতে নিষেধ করল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের ম্যানেজার ছুটে এল, 'তোমাকে ম্যাক কিছু বলেনি?'

'কী বলবে?'

'পার এক্সট্রা বাক্সের জন্যে তুমি দশ ডলার করে পাবে।'

'না। বলেনি।'

'তা হলে বলতে ভুলে গেছে। তোমার আগে যারা আসত তারা নিয়মটা জানত। তুমি নতুন লোক, তোমার নিয়ম জানা নেই—।'

'ম্যাক কোথায়?'

'টয়লেটে।'

'ও আসুক, ততক্ষণ মাল নামানো বন্ধ থাকবে।'

'ওকে, ওকে।'

শাহিন ট্রাকের ওপর উঠে এল। তারপর অবাক হয়ে আবিষ্কার করল তার রেখে যাওয়া সেলফোন ট্রাকের ওপর নেই। ওটা নিয়ে সে নামেনি

তা পরিষ্কার মনে আছে। এরকম ঘটনা ঘটতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছিল জো। শাহিন পেছনের কেবিনে গিয়ে দ্বিতীয় সেলফোন বের করে অন করতেই ওপাশে রিং শুরু হল। তারপর দিয়াগোর গলা কানে এল, 'হেলো।'

'আমি শাহিন, শান। আমরা এখন পম্পানো বিচে। রুলে থেকে যখন ওরা নতুন বাক্স তুলেছিল তখন আমি রেস্টুরেন্টে ছিলাম ব্রেকফাস্ট করতে। ওরা বলেছিল চারটে বাক্স তুলেছে, চালানেও তাই লিখেছে। কিন্তু এখানে এসে মাল নামানোর সময় দেখছি ওরা মিথ্যে বলেছে। চার নয়, সাতটা তুলেছে। কী করব?' শাহিন শেষ করামাত্র দিয়াগো হো হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে সে জো-কে বলল, 'দ্যাখো, আমার ফোরকাস্ট কী করে মিলে গেল। লোডিং-এর সময় শান ওখানে ছিল না। ওরা চালানে চার লিখেছিল। এখন মাল নামাবার সময় ডিফারেন্স দেখতে পেয়ে শান জিজ্ঞাসা করছে ও কী করবে?'

জো বলল, 'তাই! অদ্ভুত। দাও আমাকে।' তারপর জো-এর গলা কানে এল, 'শান, তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য আমি এটা সাজিয়েছিলাম। তুমি যখন রুলে ছাড়ার পর বললে চারটে বাক্স এক্সট্রা উঠেছে তখন আমাদের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দিয়াগো জোর দিয়ে বলেছিল তুমি চোর নও, এখন সেটাই প্রমাণ হল। থ্যাঙ্ক ইউ।'

'আমি ওদের কী বলব?'

'এখন তোমার যা ইচ্ছে, তাই।' জো ফোন রেখে দিল।

ম্যাক ফিরে এল মিনিট কুড়ি পরে। শাহিন তাকে দেখে নীচে নেমে আসতেই সে বলল, 'আমি ভাবতে পারিনি তুমি এত বুদ্ধিমান।'

'কেন?'

'সত্যি কথা বলে জো-এর মন জয় করে নিয়েছ? গুড। এখন মাল নামাতে বলো। আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

মাল নামিয়ে সাতটা বাক্সের ভাড়া চেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করার কথা ম্যানেজারকে বলে শাহিন ম্যাকের কাছে এল। 'তোমার ডিউটি কি এখানেই শেষ?'

'তাই তো কথা ছিল। এখন মায়ামি বিচ বলছে ট্রাকটা ওদের ওখানে

যদি দয়া করে পৌঁছে দিই! মুখে আপত্তি জানিয়েছি কিন্তু মায়ামিতে আমি আজই যেতাম। ওখানে আমার গার্লফ্রেন্ড আছে।' চোখ ছোট করে হাসল ম্যাক।

সব কিছু ঠিকঠাক হওয়ার পর চেক ফাইলে রেখে গাড়িতে উঠে জো-কে জানাতে সে বলল মায়ামিতে গিয়ে ফোন করতে। ওদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, শাখার নম্বর পেছনে লিখে ড্রপ বাক্সে ফেলে দিলেই হবে। হারিয়ে যাওয়া সেলফোনটাকে শাহিন পায়ের কাছে দেখতে পেল। কিন্তু খোঁজাখুঁজির সময় ওটা ওখানে যে ছিল না তাতে তার সন্দেহ নেই। কিন্তু এ নিয়ে একটা কথাও বলল না সে। এই প্রথম নয়, জীবনে বেশ কয়েকবার সত্যি কথা বলার জন্য বড় ক্ষতি থেকে বেঁচে গিয়েছে শাহিন। স্কুলের মাস্টার রহমান সাহেব বলতেন, 'যখনই কোনও কথা মুখ থিকা বের করবা তখনই তা আল্লার কাছে পৌঁছোয়। তুমি যা বলবা সেইমতো আল্লা তোমার বিচার করবেন। মনে রাখবা সত্যের জয় সর্বত্র।'

এখানে সূর্য কখন অস্ত যায়? ফরিদপুরে যখন ঘন অন্ধকার, আমেরিকায় দুপুর-পার-হওয়া আলো। গ্যারাজে গাড়ি ঢুকিয়ে শাহিনকে নিয়ে ম্যানেজারের ঘরে গেল ম্যাক। সে জানাল কাল রাত্রে অন্য কোম্পানির ট্রাক নিয়ে তাকে ফিরে যেতে হবে নিউইয়র্কে। ইউনাইটেড ক্যারিয়ারের এই ট্রাকটা যাবে শিকাগো। ওদের মালিকদের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।

ম্যাক হাসল, 'শান, শিকাগো তোমার খুব ভাল লাগবে। সবসময় ওই শহরে বাতাস জোরে বয়ে যায় বলে ওর একটা নাম উইন্ডি সিটি। ওকে, মাই ব্রাদার, আমাকে এখন যেতে হবে।'

শাহিন একটু অসহায় বোধ করল, 'কখন ছাড়বে ট্রাক?'

ম্যানেজার বলল, 'পরশু সকালে।'

'আমি এখানে আগে আসিনি।'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল লোকটা, 'জো বলেছে তোমার কথা। বাঁ দিকে মিনিট দুয়েক হাঁটলেই ডানদিকে মেরিস হাট দেখতে পাবে। ওটা এক ধরনের মোটেল। আমরা ওর রেগুলার ক্লায়েন্ট।'

ব্যাগ নিয়ে ম্যাকের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে করমর্দন করল শাহিন। ম্যাক বলল, 'তুমি খুব ভাল ছেলে। আবার দেখা হবে। বাই।' এসে উলটোদিকে হেঁটে গেল দ্রুত পায়ে।

বাঁ দিকে তিন মিনিট হাঁটার পর উলটোদিকে 'মেরিস হাট' চোখে পড়ল। এল শেপের একটা বাড়ি। ওপরে নিজস্ব সাইন। 'নো ভ্যাকেন্সি'র 'নো' জ্বলছে না। অবশ্য সূর্যের আলো ওখানে না পড়লেও ওটা খারাপ হয়ে থাকতে পারে।

সামনেই অফিসঘর। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই একজন মধ্যবয়সিনী সাদা চামড়ার মহিলা কাউন্টারের পেছনে উঠে দাঁড়ালেন, 'ইয়েস!'

'ঘর খালি আছে?'

'পৃথিবীর যে-কোনও মোটেলে গিয়ে যদি দ্যাখো ঘর খালি নেই তা হলে জানবে এখানে তোমার জন্য একটা খালি ঘর অপেক্ষা করছে।'

'ধন্যবাদ। আমাকে উলটোদিকের গ্যারাজ থেকে আপনার কাছে পাঠাল।'

'সো নাইস অফ দেম। তুমি কি একা?'

'হ্যাঁ।'

একটা লম্বা কার্ড বের করে রেজিস্ট্রার খুলে এগিয়ে দিল মহিলা। রুম নাম্বার সেভেনটিন। নাম, ঠিকানা আর সিগনেচার।

ইচ্ছে করেই নামের জায়গায় শান লিখল, ঠিকানার পাশে ইউনাইটেড ক্যারিয়ারের ঠিকানা দিয়ে সই করল শাহিন। তারপর জো-এর দেওয়া কার্ড এগিয়ে দিতেই মহিলা দু'বার নজর বুলিয়ে ফেরত দিলেন, 'ভালভাবে থাকো। হ্যাঁ, থার্টি ফাইভ ডলার্স আ ডে। কিন্তু তুমি পাঁচ ডলার কম দিয়ো। আর একটা কথা, অচেনা মেয়েকে কখনও ঘরে নিয়ে যেয়ো না!'

'কেন?'

'কার কী অসুখ আছে তা তুমি বাইরে থেকে দেখে বুঝতে পারবে না। তা ছাড়া কার মনে কী মতলব তা তুমি টের পাবে কী করে? আহা, আমি জানি তোমরা যারা ট্রান্সপোর্ট বিজনেসে আছ তারা খুব লোনলি

বোধ করো। কিন্তু আমার তো উচিত তোমাকে সতর্ক করে দেওয়া!' ভদ্রমহিলা কথা শেষ করতেই ছিপছিপে শরীরের বেশ লম্বা একটি তামাটে মেয়ে অফিসরুমে ঢুকে বলল, 'আমি টায়ার্ড! একা কোথাও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা যে কী কষ্টকর। যাক গে, আমার ডিউটি এগিয়ে আনা যায় না?'

'কী করে যাবে? আজ রাত্রে টমের ডিউটি। তোমার সকাল সাড়ে আটটায়।' মহিলা হাসলেন, 'আজ বাড়ি ফিরে না গিয়ে তুমি ইচ্ছে করলে এই ঘরে রেস্ট নিতে পারো। একটা ইজিচেয়ার আনিয়ে নিলেই হল।'

'আর ইউ ম্যাড? টমের সঙ্গে আমি?' কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটি।

মহিলা চাবি শাহিনের হাতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি ফ্লোরিডায় এই প্রথমবার আসছ না আগেও এসেছ?'

'এই প্রথমবার। আগে ভাবতাম ফ্লোরিডা একটা জায়গার নাম। এটা যে একটা স্টেটের নাম তা জানা ছিল না।'

'জুয়া, তোমার যদি সময় থাকে তা হলে শানকে এসকর্ট করতে পারো। আমার মনে হচ্ছে ও মানুষ হিসেবে ভাল।'

জুয়া হাসল, 'রাত বারোটা পর্যন্ত যা যা দেখতে চাও সব ঘুরিয়ে দেখাব। শুধু দেখানোর জন্যে একশো ডলার দিতে হবে, প্লাস যাতায়াতের এবং খাওয়াদাওয়ার খরচ। ওকে?'

শাহিন হাসল, 'অনেক ধন্যবাদ। আমার কোম্পানি এই খরচ অ্যালাউ করবে না।' চাবি নিয়ে বেরিয়ে এল সে। লম্বা করিডর ধরে হেঁটে সতেরো নম্বর ঘরের দরজায় কার্ড ঢোকাতে সেটা খুলে গেল। দরজার পাশের দেওয়ালে আটকানো একটা পেতলের খাঁজে কার্ডটা ঢোকাতেই আলো জ্বলে উঠল। দরজা বন্ধ করে ঘরটাকে দেখল। দারুণ বিছানা। টেবিল চেয়ার, আয়না এবং টিভি। বাথরুম ঝকঝকে এবং পরিষ্কার। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে জামাপ্যান্ট খুলে উদোম হয়ে স্নান করে নিল সে শাওয়ার খুলে। তারপর পরিষ্কার শুকনো তোয়ালে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল শাহিন। আঃ, কী আরাম! এরকম সুখ তার কপালে লেখা আছে তা দু'দিন আগেও সে জানত না। এবং তখনই তার মনে

আম্মুর মুখ ভেসে উঠল। আম্মু কাঁদছিল। কেন? ঘরে টেলিফোন আছে। উঠে গেল সে টেলিফোনের পাশে। সেখানে একটা কার্ডে স্পষ্ট লেখা, 'ইন্টারন্যাশনল কল এই ফোন থেকে করা যাবে না।'

আবার শুয়ে পড়ল শাহিন।

কে তাকে বেশি ভালবাসে? আব্বু না আম্মু? আম্মুর ভালবাসা বেশি স্পষ্ট, খোলাখুলি। আম্মু লুকিয়ে রাখতে পারে না। আব্বু সহজে মনের কথা মুখে বলে না। তবে যেদিন ঢাকার বিমানবন্দরের দিকে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আব্বুকে সালাম করতে গেল, সেদিন আব্বুর গলার স্বর কেঁপে উঠেছিল। বলেছিল, 'সাবধানে থাকিস। আমাদের কথা মনে রাখিস।' তখন আব্বুর গলা শুধু কেঁপেই ওঠেনি, চোখের কোণ চিকচিক করে উঠেছিল।

কলেজে নাটক করত শাহিন। বেশ নাম হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপ সে ফরিদপুরি গলায় উচ্চারণ করত না। কিন্তু বি এ পরীক্ষা বারবার পিছিয়ে যাচ্ছিল। সেশন জ্যাম কথাটা চালু তখন। ওর সহপাঠী লতিফ বলেছিল, 'যতদিন পরীক্ষা না হয় ততদিন মঙ্গল।'

শাহিন অবাক হয়েছিল, 'এ কী কথা বলছিস?'

'দুর। পরীক্ষা হলে কী হবে? দু'মাস পরে রেজাল্ট বের হলে দেখব পঞ্চাশ কি ষাট পেয়েছি। বাসার লোক খুশি হয়ে ভাববে এবার আমি চাকরি করব। কিন্তু কে দেবে চাকরি? বাংলাদেশের হাজার হাজার ছেলে ওই নম্বর পেয়ে বেকার হয়ে বসে আছে। আমি তো ভাবছি আনোয়ার ভাই-এর চিঠি নিয়ে ঢাকায় যাব। ওখানে টিভি চ্যানেলে যদি অভিনয়ের চান্স পাই—।'

'আনোয়ার ভাই-এর জানাশোনা আছে নাকি?'

'খুউব।'

আনোয়ারভাই ফরিদপুর শহরের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। ঢাকায় তাঁর একটি নাটকের দল আছে। গ্রুপ থিয়েটার। আগে ঘনঘন ঢাকা-ফরিদপুর করতেন, এখন ছ'সপ্তাহে একদিন আসেন।

মোটেলের বিছানায় চিত হয়ে শুয়েও আনোয়ার ভাই-এর মুখ স্পষ্ট মনে করতে পারল শাহিন। অত্যন্ত সিরিয়াস মানুষ। লতিফ তাকে জোর

করে নিয়ে গিয়েছিল আনোয়ার ভাই-এর বাসায়। তখন তিনি ফিরে যাচ্ছেন ঢাকায়। বললেন, 'কেমন আছ তোমরা?'

শাহিন বলেছিল, 'ভাল না। পরীক্ষা হচ্ছে না। কিছু করার নেই।'

'কেন? নাটকের গ্রুপে জয়েন করছ না কেন? এখন তো এই শহরে চারটে ভাল গ্রুপ আছে।' কথাগুলো বলে শাহিনের দিকে তাকালেন তিনি, 'তুমি সামনের বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকায় আসতে পারবে?'

কিছু না জেনেই শাহিন ঘাড় নেড়েছিল, 'পারব।'

'গুড। চলে এসো। এই রাখো আমার কার্ড!' পকেট থেকে কার্ড বের করে দিলেন আনোয়ার ভাই, 'লতিফ, তোমার উদ্দেশ্য কী?'

'টিভি-নাটকে পার্ট করতে চাই।' লতিফ সরাসরি বলল।

'বেশ তো। বি টিভিতে গিয়ে আবেদন করো। আমি টিভি-নাটক করি না, ও ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আচ্ছা—!'

আগে ফরিদপুর থেকে বিকেলে ঢাকায় পৌঁছালে আর ফিরে আসা যেত না সেই রাত্রে। এখন দিনরাত বাস চলে। কিন্তু যাতায়াদের ভাড়া যে আব্বুর কাছে চাওয়া যাবে না তা শাহিন জানে। আজ সকালে আব্বু আম্মুকে বলেছে, 'এখন ওসব চিন্তা কোরো না। হাত খালি। ধার করে সংসার চালাচ্ছি।'

বৃহস্পতিবারে লতিফ জিজ্ঞাসা করল, 'ঢাকায় যাবি না?'

'না।'

'সেকী? কেন?'

'বাসভাড়া নেই। আব্বুর কাছে টাকা নেই।'

সমস্যা যেন লতিফেরই হয়ে গেল। ওর খালাত বোন আমিনা টিউশুনি করে। সংসারে অভাব নেই বলে সেই টিউশুনির টাকা নিজের ইচ্ছেমতো খরচ করে। তার কাছ থেকে বাসভাড়া ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত টাকা ধার করে নিয়ে এল লতিফ।

আব্বু-আম্মুকে বলে দুপুরের বাস ধরে ঢাকায় চলে এল শাহিন। আনোয়ার ভাই-এর ঠিকানা গুলশন। সেখানে গিয়ে শুনতে পেল তিনি কাউকে বিদায় জানাতে এয়ারপোর্ট গিয়েছেন। জীবনে কখনও ঢাকার এয়ারপোর্ট দেখেনি শাহিন। একটা সি এন জি-তে শেয়ার

করে এয়ারপোর্টে চলে এসে সে তো বেশ অবাক। ট্যাক্সি, গাড়ি করে লোকজন আসছে, নেমে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। তার মাথার ওপর প্লেন উড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর কোনও না কোনও দেশে। একটু বাদেই তার নজর পড়ল দলটার দিকে। পাজামা-শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জিশার্ট পরা ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের হাতে ছোট টিনের সুটকেস আর শতরঞ্জি-মোড়া ছোট বেডিং। এরা কোথায় যাচ্ছে? সে লক্ষ করল অনেকের মাথা থেকে তেল গড়িয়ে পড়েছে গালে, ঘাড়ে। আঠারো থেকে তিরিশের মধ্যে এদের বয়স। দেখলেই বোঝা যায় খুব গরিব ঘরের গ্রামের ছেলে।

শাহিন এগিয়ে গেল, 'আপনারা কোথায় যান ভাই?'

'আরব।'

'আরব?'

'আরব দেশ জানেন না? মরুভূমির দেশ। পানির খুব দাম।'

'ওখানে সবাই কী করবেন?'

'কাম।'

কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলে শাহিনের সামনে একটা নতুন জগৎ খুলে গেল। এদের পাসপোর্ট-ভিসা থেকে শুরু করে প্লেনের টিকিটের জন্যে এক পয়সাও খরচ হয়নি। সব দিয়েছে দালাল কোম্পানি। শেখদের ফ্যাক্টরিতে চাকরি করে যে-বেতন পাবে, তা থেকে মাসে সত্তর ভাগ কেটে নেবে কোম্পানি যতদিন খরচের টাকা না ওঠে। ওই তিরিশ ভাগ যা হাতে থাকবে তার কুড়ি ভাগ এরা দেশে পাঠাবে। মাইনে কত পাবে তা এক-এক জন এক-এক রকম বলল। তবে পাঁচ বছরের মধ্যে কোম্পানির টাকা শোধ হয়ে যাবে। তখন রোজগারও বাড়বে আর দেশেও বেশি পাঠাতে পারবে। পাঁচটা বছর একটু কষ্ট করে থাকতে হবে, এই আর কী!

বাংলাদেশ পানির দেশ। সেই পানির দেশের মানুষ মরুভূমিতে গিয়ে সারাদিনে এক গ্লাস পানি পাবে কিনা সন্দেহ। তাদের গ্রামে এই দালাল কোম্পানি এখনও যায়নি। গেলে প্রচুর ছেলে খাতায় নাম লেখাত। সবাই রোজগার করতে চায়। রোজগার করা টাকা বাসায় পাঠাতে চায়।

তার জন্য পানি না খেয়ে যদি থাকতে হয়, তাও থাকবে।

এয়ারপোর্টটাই ঘুরে দেখা হল কিন্তু আনোয়ার ভাইকে দেখতে পেল না সে। তার ধারণা ছিল না জায়গাটা এত বিশাল। এত মানুষ এখানে? জানলে অবশ্যই আসত না। আবার না এলে ওই ছেলেদের দেখা পেত না।

গুলশনে ফিরে এসে সে দেখল আনোয়ারভাই বাসা থেকে বের হচ্ছে। বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'ভাবলাম এয়ারপোর্টে গেলে আপনার দেখা পাব!'

'আমি তো ওকে এয়ারপোর্টে নামিয়েই চলে এসেছি। চলো।'

'কোথায়?'

'রিহার্সালে। নতুন নাটক নামাচ্ছি। ঠিক তোমার বয়সি একটি চরিত্রে যে রিহার্সাল দিচ্ছিল সে ইন্ডিয়ায় গিয়েছিল সাত দিনের জন্য। এখন শুনছি আজমির শরিফ করে আসবে। অর্থাৎ নাটক তার কাছে কোনও গুরুত্ব পায় না। তুমি যদি ঠিকঠাক করতে পারো তা হলে বেঁচে যাই।' আনোয়ার ভাই বললেন।

'কিন্তু আমার তো ঢাকায় থাকার জায়গা নেই। রিহার্সাল দেব কী করে?'

'আমার বাসায় থাকলে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না।'

চরিত্রটা পথেই বুঝিয়ে দিয়েছিল আনোয়ারভাই। সংলাপ হাতে পাওয়ার পর সে বলার চেষ্টা করল। আনোয়ার বললেন, 'সব ঠিক আছে শুধু একটা জিনিস্ আমি একদম চাই না। তোমার সংলাপ বলার ধরনে একটা সুর থাকছে। ওই সুর বাদ দিতে হবে। সেই রাত্রে সুর সম্পূর্ণ বাদ দিতে পারল না শাহিন। আনোয়ারভাই বললেন, 'ঠিকই তো। মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে কেউ দৌড়োয় না!'

রাত দশটায় রিহার্সাল শেষ হলে আর গ্রামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করল না শাহিন। আনোয়ার ভাই-এর সঙ্গে তাঁর বাসায় চলে এল। আনোয়ারভাই অবিবাহিত, বাসায় মা আছেন, তাঁর সঙ্গে প্রথমবার কথা হয়েছিল। হাতমুখ ধোয়ার পর বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন তিনি। বকুল কলেজে পড়ে। দাদার দলে অভিনয় করে সে।

শরীর খারাপ বলে আজ রিহার্সালে যায়নি।

খেতে বসে শাহিন লক্ষ করছিল বকুল খুব কম কথা বলে। ডানাকাটা সুন্দরী নয় সে, কিন্তু সুশ্রী না বলে পারা যাবে না। সেইসঙ্গে এক ধরনের ব্যক্তিত্ব ওর ভাবভঙ্গিতে স্পষ্ট। আনোয়ারভাই বললেন, 'সারাদিন তোমার তো কাজ নেই। যে-কোনও ধরনের কাজ করতে কি তোমার আপত্তি আছে?'

মাথা নাড়ল শাহিন, 'না।'

'গুড। দেখি চেষ্টা করে।'

দিনের বেলায় একটা কাজ জুটে গেল। ক্যুরিয়ার সার্ভিসে ডেলিভারি ম্যানের চাকরি। সাইকেলে চেপে ঘোরাঘুরি। চিঠি বা পার্সেল পিছু এক টাকা। সকাল থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে ষাট থেকে সত্তরটা ডেলিভারি স্বচ্ছন্দে দিতে পারছিল সে। একদিকে রোজ রিহার্সাল চলছে। দলের সবাই শাহিনের ব্যবহারে খুব খুশি। বকুলও রিহার্সালে আসছে। আব্বু-আম্মুকে চিঠি লিখেছে সে। একটা কাজে ব্যস্ত আছে বলে ঢাকায় থাকতে হচ্ছে তাঁরা যেন চিন্তা না করেন। সাত দিন পরে সে আনোয়ার ভাইকে সাড়ে তিনশো টাকা দিতে গেল। আনোয়ারভাই অবাক হলেন, 'কীসের টাকা?'

'আমি তো রোজগার করছি, তাই!'

'তুমি আমার পেয়িংগেস্ট নও যে টাকা নেব। যদি ওটা বাড়তি হয় তা হলে মানি-অর্ডার করে বাবাকে পাঠিয়ে দাও।' আনোয়ারভাই বললেন।

সেই প্রথম, জীবনে প্রথমবার আব্বুর নামে সাড়ে তিনশো টাকা মানি-অর্ডার করল শাহিন। জিজ্ঞাসা করে জানল কাল বিকেলেই পিয়ন পৌঁছে যাবে তাদের বাড়িতে।

নাটক মঞ্চস্থ হল। আনোয়ার ভাই-এর নামেই হাউসফুল হয়ে গিয়েছিল। দু'ঘণ্টার নাটক শেষ হওয়ামাত্র হাততালির জোয়ার উঠল। অনেকেই এসে বলে গেল শাহিনের অভিনয় খুব ভাল লেগেছে।

পরের দিনের কাগজে ছবি এবং প্রশংসা ছাপা হল।

এখন ক'দিন রিহার্সাল বন্ধ। ছুটির পর সাইকেলে চেপে ঘুরতে ঘুরতে এয়ারপোর্টে চলে এল সে। আজও সেইরকম লাইন, তবে আরবদেশ নয়, মালয়েশিয়াতে যাচ্ছে এরা। কথা বলে জানতে পারল, যাওয়ার জন্য অনেক টাকা ধার করতে হয়েছে ওদের অভিভাবকদের। গাড়ি ভাড়া, পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াও ওই দালালেরা সেলামি হিসেবে টাকা নিয়েছে এদের কাছ থেকে। এখন জমি বন্ধক রাখতে হয়েছে বটে কিন্তু গিয়ে পুরো টাকা হাতে পাবে বলে অল্প কিছুদিনের মধ্যে বন্ধকি জমি ছাড়িয়ে নিতে পারবে।

রাত্রে কথাটা আনোয়ার ভাইকে বলবে বলে ভাবছিল শাহিন। কিন্তু তার আগেই আনোয়ার ভাই বললেন, 'তোমার নিশ্চয়ই পাসপোর্ট নেই?'

মাথা নেড়েছিল শাহিন, না।

বকুল জিজ্ঞাসা করল, 'পাসপোর্টের কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

'তোমারও তো নেই?'

'না।'

'কাল আমাদের শো দেখতে এসেছিলেন কয়েকজন প্রবাসী বাঙালি। ওঁদের খুব ভাল লেগেছে নাটক। ওঁদের ওখানে নেমন্তন্ন করলেন। যাওয়া-আসা-থাকা-খাওয়ার খরচ ওঁরা বহন করবেন। তা ছাড়া শো-পিছু দেড় হাজার ডলার দেবেন।'

বকুল চোখ ছোট করল, 'বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

'কলকাতা থেকে নাটকের দল যায়। এখান থেকে গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে যাওয়া হয় প্রচুর টাকা খরচ করে। এবার হয়তো স্বাদ বদলাতে চাইছে।'

চুপচাপ শুনছিল শাহিন, জিজ্ঞাসা করল, 'কোন দেশে আছেন ওঁরা?'

'কানাডা। এবার নাকি কানাডার টরেন্টো শহরে ফোবানা হবে।'

'ফোবানা মানে?

'বাংলাদেশের যে সব মানুষ আমেরিকা এবং কানাডায় থাকেন তাঁদের বাৎসরিক মিলন উৎসব। গান বাজনা কবিতা, সাহিত্যের

আয়োজন হয়, এবার তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে নাটক। আমাদের নাটক ওঁরা ফোবানায় মঞ্চস্থ করতে চান।' আনোয়ারভাই চিন্তিত গলায় বললেন, 'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কী করে সবার পাসপোর্ট সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যাবে! তারপর সেটা পেলে ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে। আমি কাল সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব। যদি তিনি সাহায্য করেন তা হলে একটা আশা করা যেতে পারে।'

বকুল জিজ্ঞাসা করল, 'কবে ওই উৎসব হবে?'

'জুলাই মাসে। বেশি দেরি নেই।'

পরের দিন অফিসে গিয়ে পৃথিবীর মানচিত্র দেখল শাহিন। কোথায় তার বাংলাদেশ, কোথায় কানাডা। অফিসের কম্পিউটার যে চালায় তাকে জিজ্ঞাসা করতে বলল, 'এখন ঠান্ডা কমছে ওখানে, তাও চার-পাঁচ ডিগ্রি। বাংলাদেশে এগারো ডিগ্রি হলেই লোক মরে। কিন্তু মতলব কী? যাচ্ছ নাকি?'

'না না। আমি কী করে যাব?'

'আমি যেতে চেয়েছিলাম। আমার এক ফুফা ওখানে থাকে। কতবার চিঠি পাঠিয়েছি কিন্তু কানাডিয়ান সরকার ভিসা দেয়নি। ট্যুরিস্ট ভিসা ছাড়া দেয় না। আমি গেলে নাকি ফিরে আসব না তাই আমাকে ট্যুরিস্ট ভিসা দেবে না? দালাল বলেছিল ভিসা, টিকিটের ব্যবস্থা করে দেবে কিন্তু তার জন্য আমার কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা চেয়েছিল। আমি কোথায় পাব? ফাদারকে বলেছিলাম, ফাদার আমাকে বাসা থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল।'

'কিন্তু দালাল ভিসা জোগাড় করে দেবে কী করে?'

'জানি না। কিন্তু দেয়। আমার জানা দু'জন অনেক টাকা দিয়ে মেক্সিকো গিয়েছে। মেক্সিকোর ভিসা পাওয়া নাকি অনেক সোজা।'

সেই সন্ধেবেলায় রিহার্সাল রুমে বসে আনোয়ারভাই ঘোষণা করলেন যে সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রী সব রকম সাহায্য করবেন বলে কথা দিয়েছেন। আগামী পরশুর মধ্যে পাসপোর্টের জন্যে আবেদন করতে হবে। ফোবানার কর্তারা এগারো জনের আতিথ্য এবং টিকিট দেবেন। এই নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রী আটজন। মেক আপ, লাইট

এবং সেটের কাজ তিনজনে করতে পারবে না। তাই সব অভিনেতা অভিনেত্রীকে অভিনয় ছাড়াও ওইসব কাজে হাত লাগাতে হবে। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে বললেন, 'আমি যাদের নাম পড়ছি তাদের কারও পাসপোর্ট থাকলে বলবে। একে একে নাম পড়ে যেতে লাগলেন তিনি। নয় নম্বর নাম বকুলের, দশ নম্বর তাঁর নিজের আর এগার নম্বর নাম শাহিনের। নিজের নাম এত মিষ্টি কোনও দিন লাগেনি শাহিনের। দেখা গেল দু'জনের পাসপোর্ট আছে। বাকিদের কালকের মধ্যে সমস্ত কাগজপত্র, ছবি নিয়ে আসতে বললেন আনোয়ারভাই।

এই সময় একজন বয়স্ক অভিনেতা বললেন, 'আনোয়ারভাই, একটা কথা বলি। শাহিন ভাল ছেলে, ওর বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু ও দলে এসেছে সামান্য ক'দিন হল। দলের জন্য দীর্ঘদিন কাজ করেছে এমন অনেককে বঞ্চিত করে ওকে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া কি ঠিক কাজ হচ্ছে?'

মাথা নাড়লেন আনোয়ারভাই, 'ঠিক বলেছেন। আমরা মাত্র এগারো জনের টিকিট পাচ্ছি। যদি সামর্থ্য থাকত, তা হলে দলের বাকিদেরও নিয়ে যেতে পারতাম। তাতে তো আমাদেরই কাজের সুবিধে হত। কিন্তু সেই সামর্থ্য তো নেই। আর শাহিন যে অভিনয় করেছে সেটুকু যদি দলের কেউ করে দেখাতে পারে তা হলে শাহিন যাবে না। সে-ই যাবে। আমরা বিদেশে যাচ্ছি। দলে কে পুরনো কে নতুন তা নিয়ে ওখানকার দর্শকেরা ভাববেন না। আমরাও চাইব সবচেয়ে ভাল যা তাই পরিবেশন করতে।'

প্রত্যেকের দিকে তাকালেন আনোয়ারভাই, 'বেশ। যে যে ওই চরিত্রে অভিনয় করতে চাও উঠে দাঁড়াও। অডিশন হয়ে যাক।'

দেখা গেল কেউ উঠছে না।

পরের দিন বেশিরভাগ কাগজে বেরিয়ে গেল খবরটা। আনোয়ারভাই নতুন নাটক নিয়ে কানাডায় যাচ্ছেন। ছুটি নিয়ে গ্রামে এল শাহিন। তার বার্থ সার্টিফিকেট, স্কুল ও কলেজের প্রমাণপত্র, ছবির কপি নিয়ে হেডমাস্টার মশাইকে দিয়ে অ্যাটেস্ট করিয়ে নিল। সব শুনে আব্বু-

আম্মু খুব খুশি। আম্মু জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে, ওখানে গিয়ে নাটক করবি, ওরা তোকে টাকা দেবে?

'হ্যাঁ দেবে।' হেসে ফেলেছিল শাহিন।

আব্বু বলল, 'কানাডায় যখন অনেক বাংলাদেশের মানুষ আছেন তা হলে দ্যাখো না, ওখানে যদি চাকরি জোগাড় করতে পারো। বিদেশি টাকায় মাইনে বেশি হবে।'

আব্বুর কথাটা মাথার ভেতরে ঢুকে গেল। কিন্তু পাসপোর্ট যখন হাতে এল তখন সে জানতে পেরেছে ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে বিদেশে গেলে সেখানে চাকরি পাওয়া এবং করা আইনবিরুদ্ধ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে আসা বাধ্যতামূলক।

শুক্রবারটা অন্যভাবে কাটাত শাহিন। অন্যান্য বাসায় নাস্তা হত পরোটা, মাংস, ক্ষীর দিয়ে। কিন্তু আনোয়ারভাই সকালে ওইসব ভারী খাবার পছন্দ করতেন না। হেসে বলতেন, 'যদি সার্ভে করা হয় তা হলে দেখবে বাংলাদেশের শহরের মানুষদের মধ্যে যাঁরা পঞ্চাশ পেরিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশের হার্টের কোনও সমস্যা আছে। এত পরোটা আর লাল মাংস খেলে হার্টে তো চোট লাগবেই। তাই কর্নফ্লেক্স, কলা এবং দুধ দিয়ে অথবা রুটি তরকারি হত ওই বাড়ির নাস্তায়। সঙ্গে মিষ্টি। তাই খেয়ে সকাল দশটায় বেরিয়ে পড়ত শাহিন সাইকেল চেপে। সারাদিন ধরে ঘুরে ঘুরে সে ঢাকা শহরটাকে দেখত। মাঝে মাঝেই মিটিং-মিছিলে সে আটকে যেত। সেটা ভালই লাগত। সেই মিটিংগুলো বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো থেকে ডাকা হত। বক্তারা কী সুন্দর ভাষায় রক্ত গরম করা বক্তব্য বলতেন। গলার স্বর অনেকটা ওপরে তুলে লাউডস্পিকারকে ঠিকঠাক ব্যবহার করে প্রায় যুদ্ধের বাতাবরণ সৃষ্টি করতেন। সেসব শুনতে শুনতে দিব্যি কেটে যেত সময়টা।

এই শুক্রবার নাস্তা করার পর এক ভদ্রলোক আনোয়ার ভাই-এর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মধ্যবয়স্ক মানুষটির বেশ সুখী সুখী চেহারা।

চেয়ারে বসে ভদ্রলোক বললেন, 'আমাকে সবাই মতিনভাই বলে। ব্যাবসা করি। এম এ মতিন। এইভাবে আগাম না জানিয়ে আসার জন্য দুঃখিত।'

আনোয়ারভাই বললেন, 'ছুটির সকালে তো বাড়িতেই থাকি। বলুন।'

'আপনার নাটকের দল কানাডায় অভিনয় করতে যাচ্ছে?'

'আমার নয়, আমাদের সবার দল। হ্যাঁ, যাচ্ছে।'

'আমার ভাগনা তুষার আপনার দলে আছে। শুনলাম তাকে নেওয়া হয়নি।'

'ও। আমাদের আর্থিক সচ্ছলতা থাকলে দলের সবাইকে নিয়ে যেতাম। ওরা মাত্র এগারো জনের খরচ দিচ্ছে। তুষার অভিনয়ে সেই জায়গায় যেতে পারেনি।'

'আহা, অভিনয় ছাড়াও তো অন্য অনেক রকম কাজ আছে।'

'ওই যে বললাম, ওরা এগারো জনের বেশি অ্যালাউ করছে না।'

'প্লেন ভাড়া, থাকা-খাওয়ার খরচ যদি তুষার দেয় তা হলে কি ওকে নিয়ে যেতে পারবেন?' মতিনভাই সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন।

আনোয়ারভাই হাসলেন, 'সে তো অনেক টাকা।'

'কত? সব মিলিয়ে দেড় লাখের বেশি নিশ্চয়ই নয়।'

'দেড় লাখ কি তুষারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব?'

'অবশ্যই।'

'ঠিক আছে। ওর পাসপোর্ট আছে?'

'আছে।'

'ওকে বলবেন পাসপোর্ট নম্বর আজই যেন দেয়। ফোবানা থেকে স্পনসর লেটার আসবে। তাতে যাদের নাম থাকবে তাদেরই ভিসা দেওয়ার কথা ভাববে কানাডার দূতাবাস। সময় বেশি নেই।'

'অনেক ধন্যবাদ আনোয়ারভাই। একটু পরে তুষার আপনাকে দুটো পাসপোর্ট নম্বর দিয়ে যাবে।'

চমকে উঠলেন আনোয়ার ভাই, 'দুটো মানে?'

হাসলেন মতিনভাই, 'দেখুন, তুষারের বয়স মাত্র উনিশ। ও এত আপসেট হয়ে পড়েছে যে আমাকে ওর মা অনুরোধ করল কিছু করার জন্যে। আপনি যখন ওর যাওয়ার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন তখন ওকে তো একা ছাড়া যাবে না, একজন এসকর্ট সঙ্গে থাকা দরকার। ওর মা-ও নিশ্চিন্ত হবে।'

'এসকর্টের কী দরকার?' বিরক্ত হলেন আনোয়ারভাই।

'ও তো আপনাদের এগারো জনের দলে নেই। তাই আয়োজকরা বলতেই পারেন ও আলাদা, নিজের মতো থাকবে। এসকর্ট হিসেবে আমি গেলে কোনও সমস্যা হবে না।'

'আপনি যাবেন? আপনার ভিসা?'

'তুষারের সঙ্গে আমার নামটাও পাঠাবেন। তাই পাসপোর্ট নম্বর দেব বললাম।'

'এই ক'দিনের জন্যে আপনি তিন লক্ষ টাকা খরচ করবেন?'

'এ আর এমন কী! আচ্ছা।' মতিন ওঠার ভঙ্গি করলেন?

'দাঁড়ান। আপনার এই প্রস্তাব দলের সবাইকে জানানো দরকার।'

'কেন?'

'তুষারের মতো কেউ যদি নিজের টাকায় যেতে চায় তা হলে তাকেও আমি সুযোগ দিতে বাধ্য।' আনোয়ারভাই উঠে দাঁড়ালেন।

'দেখুন। আমি ভেবেছিলাম আপনার দল যাতে আরও ভাল নাটক বানাতে পারে তাই দু'লক্ষ টাকা অনুদান দেব। আর কেউ ওই টাকা দেবে কিনা দেখুন।'

আনোয়ার ভাই-এর চোয়াল ঝুলে পড়ল।

বেরিয়ে যাওয়ার আগে মতিনভাই বললেন, 'গণতন্ত্র নিশ্চয়ই ভাল, তবে মাঝে মাঝে সেটা ঝামেলা বাড়ায়। তুষারের ব্যাপারটা নিয়ে দলে কথা বলার কী দরকার!'

সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হচ্ছিল আনোয়ার ভাই-এর। এর মধ্যেই টরেন্টো থেকে স্পনসরার হিসেবে যে-এগারো জনের যাবতীয় দায়িত্ব ওরা নেবে তার তালিকা এসে গেল। এর একটা কপি ওঁরা কানাডিয়ান অ্যাম্ব্যাসিকে মেল করে দিয়েছেন।

আনোয়ারভাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, 'দ্যাখো, দু'লাখ টাকা যদি পরের প্রোডাকশনের জন্যে পেতাম, তা হলে আমার স্বপ্ন শম্ভু মিত্রের "চাঁদ বণিকের পালা" নিয়ে নেমে পড়তাম। কলকাতায় গিয়ে অনুরোধ করলে নিশ্চয়ই অনুমতি পেতাম। ওঁরা তো আমাদের কাজ দেখেছেন। টাকাটার জন্য বড্ড লোভে পড়ে গিয়েছিলাম। মানছি

এটা অন্যায়, প্রায় ঘুষ নেওয়ার মতো ব্যাপার। লিস্টটা এসে যাওয়ায় মনে হচ্ছে রক্ষা পেলাম। তবে ওরা যদি ভিসার জন্য আবেদন করে তা হলে আমি এটুকু লিখতে পারি যে তুষার আমার দলের নিয়মিত সদস্য।. ও কানাডায় গেলে নাটকটি মঞ্চস্থ করতে সাহায্য করবে।'

এগারো জনকে একসঙ্গে ডাকল কানাডিয়ান অ্যাম্ব্যাসি। পাসপোর্টের ছবির সঙ্গে চেহারা মিলিয়ে বলল, 'নাটক করতে যাচ্ছেন, আশা করি ওখানে থেকে যাবেন না।' উত্তরটা সবাইকে শিখিয়ে রেখেছিলেন আনোয়ারভাই, 'আমরা ট্যুরিস্ট নই, নাট্যকর্মী। কাজ শেষ হলেই দেশে ফিরে আসব।'

পাসপোর্টের সাদা পাতায় কানাডায় ঢোকার এবং দশ দিন বাস করার সরকারি অনুমতির স্ট্যাম্প পড়ল।

পাসপোর্ট-এর জন্যে আবেদনের সময় আইনসংগত যে ফি দিতে হয়, তা শাহিন দিতে পারেনি। আনোয়ারভাই বললেন, 'একটা শো করলে আমরা প্রত্যেকটি নাট্যকর্মী একশো ছত্রিশ কানাডিয়ান ডলার পাব। তা থেকে ওটা কেটে নেওয়া যাবে।'

বকুল ভাল কথা বলল, 'আচ্ছা, ওরা কি আমাদের ভিখিরি ভাবে?'

'মানে?' আনোয়ারভাই তাকালেন।

'এই যে আমাদের ওদেশে যাওয়ার ব্যাপারে এত কড়াকড়ি, গেলে ফিরব না, এটা কেন ভাবে? আমাদের বাংলাদেশে যত অভাবই থাক, এই দেশ তো আমাদের মা।'

'ওরা ভয় পায়। শুধু বাংলাদেশ কেন, ইন্ডিয়া থেকে যারা যেতে চায় তাদের ক্ষেত্রে একই কড়াকড়ি। ওখানে মানুষ কম, চাকরি বেশি। টাকার দাম আমাদের থেকে অনেক গুণ, তাই থেকে গিয়ে ভাগ্য ফেরাতে চায় অনেকে। তাই ট্যুরিস্ট ভিসা দিতে ভয় পায় ওরা।' আনোয়ারভাই বললেন।

'কিন্তু ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে ওদেশে কী করে থাকবে?' বকুল জিজ্ঞাসা করেছিল। আনোয়ারভাই কোনও মন্তব্য করেননি।

তুষার দল ছেড়ে দিল। তার এবং মতিন ভাই-এর ভিসার আবেদন

নাকচ হয়েছে। কানাডিয়ান অ্যাম্ব্যাসি ট্যুরিস্ট ভিসা দিতে রাজি নয়। নাটকের জন্য যখন ফোবানা এগারো জন লোকই যথেষ্ট বলে মনে করেছে তখন ওই কাজের জন্য বাড়তি দু'জনকে ট্যুরিস্ট ভিসা দেওয়ার কোনও যুক্তি নেই।

যেভাবে ঢাকায় ওরা মঞ্চ ব্যবহার করে সেভাবে টরেন্টোতে করা যাবে না। আনোয়ারভাই খবর পেলেন কানাডার অন্য একটি শহরের বাংলাদেশের মানুষরা তাঁদের দ্বিতীয় শো করার জন্য অনুরোধ জানাতে চান, যদি ফোবানা আপত্তি না করে। ঢাকার মঞ্চে ভারী কাঠ দিয়ে সেট তৈরি করা হয়, পিছনের বড় পরদায় আলোছায়ার মায়াজাল তৈরি করা হয়। এগুলো প্লেনে নিয়ে যেতে দেবে না। আনোয়ারভাই দ্রুত প্রতীকি সেট তৈরি করালেন। সেগুলো ভাঁজ করে সুটকেসে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। রিহার্সালের সঙ্গে এই কাগজগুলোও উঠল।

বুধবার রাত্রের বিমানে ঢাকা থেকে উড়বে ওরা। সোম মঙ্গল ছুটি দেওয়া হল। বলা হল, নিজের পোশাক বেশি না নিয়ে ভারী শীতবস্ত্র যেন প্রত্যেকে নেয়। সোমবার গ্রামে চলে এল শাহিন। বাসায় তাকে নিয়ে যেন উৎসব শুরু হয়ে গেল। ওদের বংশে শাহিনই প্রথম বিদেশে যাচ্ছে। ভাইরা ঘুরেফিরে এসে যে যার মতো গোপনে বলে যাচ্ছে তার জন্যে কী আনতে হবে। আম্মু বলল, 'ওদেশে কি সোনার দাম কম?'

'কী জানি!' শাহিন বলেছিল।

আব্বু ধমকে ছিলেন, 'তোমার কি মাথা খারাপ? ওর কাছে টাকা কোথায় যে জিনিস কিনবে? সস্তায় সোনা পেলেও কিনবে কী করে? আমরা কি ওকে টাকা দিতে পারছি?'

শাহিন হেসেছিল, 'ওরা বোধহয় আমাদের কিছু টাকা দেবে। তা দিয়ে যা কেনা যায় তো তোমাদের জন্য নিয়ে আসব।'

আব্বু বলেছিল, 'কোনও দরকার নেই। যে দেশে যাচ্ছ তার ভাল ভাল জায়গা ঘুরে দেখবে। যদি টাকা বাঁচে তা হলে নিজের জন্যে ভাল শার্ট-প্যান্ট কিনবে।'

মঙ্গলবারটা যেন স্বপ্নের মতো কেটে গেল। লতিফ আর আমিনার সঙ্গে দেখা হল। আমিনার বাড়িতে। লতিফ বলল, 'গ্রাম থেকে ফরিদপুর,

ফরিদপুর থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে কানাডা। তিন মাস আগে ভাবতে পেরেছিলি?'

'না।'

লতিফ হেসেছিল, 'এর জন্যে তোর উচিত আমিনাকে ধন্যবাদ দেওয়া।'

'ওমা! কেন?' আমিনা কপট ভঙ্গি করেছিল।

'তুমি টাকা না দিলে ওর পক্ষে ঢাকায় যাওয়া সম্ভব ছিল না।'

মনে পড়ে গেল শাহিনের। সাততাড়াতাড়ি পকেট থেকে টাকা বের করে বলল, 'আমার অনেক আগেই পাঠানো উচিত ছিল!'

আমিনা জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কী করছেন?'

'যে টাকাটা নিয়েছিলাম—!'

'সেই টাকাটাই দিন।'

'তার মানে?'

'সেই নোটগুলো। ওগুলো তো সেই নোট নয়।'

'সেগুলো তো খরচ হয়ে গেছে। কোথায় কার কাছে আছে জানি না।'

'যখন জানবেন এসে ফেরত দেবেন। ততদিন আমি বেশ ভাবতে পারব একজনের কাছে আমি কিছু পাই, একজন আমার কাছে ঋণী।' বলে শব্দ করে হেসে উঠেছিল আমিনা।

বুধবার সকালে বিদায় নেওয়ার সময় আম্মু জড়িয়ে ধরল। ভাইবোনেরা মিটিমিটি হাসছিল। ওরা ব্যাগ নিয়ে আগেই পৌঁছে গেল বাসস্ট্যান্ডে। আব্বু তার সঙ্গে হেঁটে আসছিল। গ্রামের পথে দাঁড়াতে হচ্ছিল পায়ে পায়ে। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছিল সে-ই জিজ্ঞাসা করছিল, প্লেনের টিকিটের দাম কত, কে টাকাটা দিল, কেন দিল থেকে শুরু করে কীভাবে ভিসা পাওয়া গেল? প্রথম প্রথম উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছিল শাহিন। কিন্তু উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তার মন ভরছিল না। একজন তো বলেই ফেলল, 'তুমি তো সিনেমায় নামোনি, টিভিতেও নাটক করোনি, তোমাকে এত পয়সা খরচ করে কেন নিয়ে যাবে? অন্য কোনও ব্যাপার আছে যেটা বলতে চাইছ না। বললে গাঁয়ের অন্য ছেলেরাও যেতে চাইবে। এটা

তুমি ঠিক করলে না।'

আব্বু খুব চটে গেল। প্রায় জোর করেই তাকে সরিয়ে নিয়ে এসে বলল, 'মানুষ সত্যি কথা আর সরলভাবে নিতে পারে না। চলো দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

বাসে তুলে দিয়ে আব্বু জিজ্ঞাসা করল, 'বাসভাড়া আছে তো?'

হেসে ফেলল শাহিন। বলল, 'আছে।'

'তোমার প্লেন ঢাকা থেকে কখন ছাড়বে?'

'শুনেছি রাত সাড়ে নটায়।' শাহিন বলল।

'ও। নটা বেজে পঞ্চাশ মিনিট নাগাদ আমাদের আকাশ দিয়ে একটা প্লেন উড়ে যায়। ঢাকা থেকে ফরিদপুর আসতে যদি কুড়ি মিনিট লেগে যায় তা হলে কানাডায় পৌঁছোবে কতক্ষণ পরে কে জানে। যখন আজ প্লেনটা উড়ে যাবে তখন তোমার আম্মুকে দেখাব।' আব্বু হাসল।

ন'টা পঁয়ত্রিশে প্লেনটা গাড়ির মতো চলতে শুরু করেছিল। তারপর একটু চলে আবার থামল। এই করতে করতে যখন গতি বাড়িয়ে আকাশে উড়ল তখন পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে। ন'টা বেজে পঞ্চাশ মিনিট যখন ঘড়ির কাঁটা ছুঁল তখন নীচের দিকে তাকাল সে। জানলার পাশে বসে প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। এই প্লেন নিশ্চয়ই তাদের গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আর ভেতরের উঠোনে দাঁড়িয়ে আব্বু বলছে, 'ওই যে, ওই প্লেন, ওখানে তোমার ছেলে শাহিন বসে আছে।' আম্মু কি প্লেনটাকে ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছে?

জিয়া এয়ারপোর্টে তাদের বিদায় দিতে অনেকে এসেছিল। বাকি দশজনের আত্মীয়স্বজন ছাড়াও কিছু নাট্যকর্মী এসেছিলেন। ওরা যখন লাইন দিয়ে এয়ারপোর্টের ভেতর ঢুকছিল তখন সেই আরবদেশ অথবা মালয়েশিয়ায় চাকরি করতে যাওয়া ছেলেদের কথা মনে এল। ওরা গেছে শ্রমের বিনিময়ে অর্থ রোজগার করে পরিবারের সমস্যা মেটাতে, আর সে যাচ্ছে নাটক করার সুযোগ নিয়ে দেশ দেখতে। ইমিগ্রেশন অথবা কাস্টমস পার হতে ঝামেলা হয়নি। ওখানে যেসব ফর্ম ভরতি করতে হয়েছিল তা দলের সিনিয়াররাই দায়িত্ব নিয়ে করেছে। তারপর

যখন প্লেনে ওঠার সময় হল তখন খুব হতাশ শাহিন। প্লেনটাকে দেখার সুযোগই পাওয়া গেল না। সুড়ঙ্গপথে একেবারে প্লেনের পেটে ঢুকে পড়তে হল। টিকিট ইত্যাদি এখন হাতব্যাগে, বুক পকেটে বোর্ডিং কার্ড। প্লেনের ভেতরে পা দিয়ে তাজ্জব হয়ে গেল সে। এত বড় প্লেন? যেন বিশাল হলঘর কয়েকটা। কী করে আকাশে উড়বে?

জানলার ধারের সিটটা ছিল বন্যা আপার। তিনি বললেন, 'শাহিন তুমি আমার সিটে বসো। আমি মাঝখানে বসব। বকুল তুমি আমার ডানদিকে বসো।'

শাহিন বলল, 'জানলার পাশে বসলে বাইরেটা দেখতে পেতেন আপা।'

'না বাবা। ওপর থেকে দেখলে আমার মাথা ঘুরবে। আমাকে সবাই বলেছে প্লেনে উঠে চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করবে। তা হলে শরীর খারাপ হবে না।' জানলার পাশে বসতে পেরে খুশি হল শাহিন। প্লেনটা যখন আকাশে উড়ছিল তখন সে সাদা মেঘ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা জ্বলছে। আচ্ছা, একটু কি কাছে লাগছে তারাদের? আকাশটা এখন কী মায়াময়।'

একটু পরেই দুই সুন্দরী বিমানসেবিকা একটা ট্রলি নিয়ে এলেন। হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্কচ, বিয়ার আর কোক? ইউ মে হ্যাভ অ্যাপল জুস!'

বকুল বলল, 'আপেল জুস।'

বন্যা আপা বললেন, 'আমাকেও তাই দিতে বলো। বিনাপয়সায় দেয়, বুঝলি। শাহিন তুমি কি মদ খাবে?'

শাহিন দ্রুত মাথা নেড়েছিল, 'না না। আপনারা যা খাবেন তাই দিতে বলুন।'

ঢাকা থেকে দুবাই, দুবাই থেকে সোজা টরন্টো। দুবাইতে নেমে সে দেখেছিল দলের কয়েকজন একটা করে স্কচ হুইস্কি খেয়েছে। আনোয়ারভাই জেনেও না জানার ভান করে ছিলেন।

ঢাকা এয়ারপোর্টে আনোয়ারভাই এয়ারলাইন্সকে বলেছিলেন তাঁদের এগারো জনের খাবারে হ্যাম বা পর্ক জাতীয় কোনও খাবার না দেওয়া

হয়। এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে তাঁরা যথেষ্ট সজাগ। ঢাকা থেকে তাঁদের যেসব উড়ান আছে তাতে ওই জাতীয় খাবার দেওয়ার প্রশ্ন নেই।

কিন্তু দুবাই এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করার সময় আনোয়ারভাই ঠিক ভরসা পেলেন না। গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ ওই এয়ারপোর্টে গিজগিজ করছেন। এখান থেকে কানাডার উড়ানে ওইসব খাবার পরিবেশন করা অস্বাভাবিক নয়। তিনি দলের সবাইকে বললেন, 'আমরা সবাই এই ফ্লাইটে ভেজ খাব। খাবার নিরামিষ হলে কোনও সমস্যা থাকবে না।'

দেখা গেল নিরামিষ খাবার রীতিমত সুস্বাদু। এবার প্লেনের যাত্রী বদলে গেছে কিন্তু তাদের সিট পালটায়নি। বকুল জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কি টরেন্টোতে গিয়েও নিরামিষ খাব?'

বন্যা আপা বললেন, 'না বোধহয়। আমার এক রিলেটিভ ভ্যাঙ্কুভারে থাকে। ওরা বলে ওখানে সস্তায় চিকেন, মাছ পাওয়া যায়।'

'আমাদের সেকেন্ড শো ওখানে হবে বলে মনে হচ্ছে। হলে তোমার আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে মাছ-ভাত খাব।' বকুল হাসল।

'তা খাস। কিন্তু আমি মাত্র তিনটে ভাল জামদানি এনেছি। সবাই বলল, এত ঠান্ডা যে শাড়ি পরার সুযোগই পাবে না।'

'সিল্ক আনোনি?'

'না।'

'আমার কাছে এক্সট্রা আছে, দেব তোমাকে।'

'তোর বয়স আর আমার বয়স এক নাকি? রঙে মানাবে কেন?'

'কেন? তোমার এমন কী বয়স? তা ছাড়া বিদেশে ওসব কে দেখবে?'

শাহিনের ভাল লাগছিল না এসব কথা শুনতে। তিরিশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠেও মেয়েরা কী করে শাড়ির গল্প করেন? বকুল তো অন্য ধরনের মেয়ে। তবে?

টরেন্টো এয়ারপোর্টের বাইরে এসে শাহিন বুঝতে পারল জিয়া

এয়ারপোর্টের সঙ্গে কোনও মিল নেই। যাঁরা তাদের রিসিভ করতে এসেছিলেন তাঁদের হাসি মুখ দেখতে ভাল লেগেছিল। একটা মাইক্রো বাসে তাদের তুলে নিয়ে আসা হল যে হোটেলে তার ঘরের ভাড়া প্রতিরাত্রে তিনশো ডলার। বাংলাদেশের টাকায় সেটা হিসেব করতে গিয়ে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। হোটেল থেকে মাত্র পনেরো মিনিট দূরে ফেস্টিভ্যাল হল। ওখানেই ফোবানা হচ্ছে। ওরা জানতে পারল ওদের নাটক পরশু সন্ধেবেলায়। যে প্রেক্ষাগৃহে নাটক করতে হবে সেখানে আড়াই হাজার দর্শকের বসার ব্যবস্থা আছে। আনোয়ারভাই বললেন, 'যে যার ঘরে চলে যাও। দু'ঘণ্টা বাদে ডিনার। দু' ঘণ্টা বাদে সবাই রিসেপশনে চলে এসো।'

স্বপ্নের মতো লেগেছিল ফোবানার দিনগুলো। শো-এর আগের দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হোটেলের ঘরে বসে রিহার্সাল করা হয়েছে। দর্শকভরতি প্রেক্ষাগৃহে যখন নাটকটিতে অভিনয় শেষ হল আর হাততালিতে সবাই উচ্ছ্বসিত হলেন।

কিন্তু সেদিনই খারাপ খবরটা এল। ভ্যাঙ্কুভারে যাঁরা নাটক করাতে চেয়েছিলেন তাঁদের প্রধান উদ্যোক্তা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন বলে ওঁরা শো ক্যানসেল করেছে। আনোয়ারভাই টরেন্টোয় থাকার সময়টা কমাতে বাধ্য হলেন। দশ দিন নয়, সাত দিনের মাথায় দেশে ফিরে যেতে চান তাঁরা। মুশকিল হল, এগারো জনের সিট একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছিল না। ঠিক হল যতগুলো পাওয়া যাচ্ছে ততগুলোই নেওয়া যাক। বাকিরা পরের ফ্লাইটগুলোয় যাবে।

ফোবানার কর্তারা তাঁদের টরেন্টো শহরটা ঘুরিয়ে দেখালেন। ওরা মুগ্ধ হয়ে দেখল কত মানুষ রাস্তায় অথচ সব কিছু ঠিকঠাক চলছে। এত পরিষ্কার এবং চওড়া রাস্তা, ঝকঝকে গাড়ি বাংলাদেশে দেখা যায় না। বন্যা আপা একবার বাসে চেপে ইন্ডিয়ায় গিয়েছিলেন। বললেন, 'আমাদের ঢাকার রাস্তায় তবু বিদেশি গাড়ি চলে, ইন্ডিয়ায় তো কেউ চোখেও দ্যাখেনি। সব মারুতি আর অ্যাম্বাসাডার। রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ।'

ফুয়াদ নামের একটি ছেলে প্রথম দিন থেকেই তাদের দলের সঙ্গে

মিশে গিয়েছিল। লম্বা ছিপছিপে ছেলেটি চমৎকার ইংরেজি বলে। একদিন পরে বকুল শাহিনকে বলেছিল, 'ওই ফুয়াদ যখন আসবে তখন তুমি আমার কাছাকাছি থাকবে।'

'কেন?' শাহিন তাকিয়েছিল।

'ওর মতলব ভাল না। কেবলই বলে, চলো তোমাকে ওখানে নিয়ে যাই, এখানে নিয়ে যাই। এরা বোধহয় ভাবে, আমরা খুব সস্তা।' বকুল বলেছিল।

তাই করত শাহিন, ফুয়াদকে দেখলেই বকুলের পাশে চলে আসত। কিন্তু বকুলের মুখে ওই কথা শোনা ছাড়া শাহিন ফুয়াদের আচরণে কোনও খুঁত ধরতে পারেনি। ফুয়াদ গল্প করছিল, প্রথম দিকে তাকে এখানে থাকার জন্যে কত লড়াই করতে হয়েছে। বড় ভাই-এর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে সে ঢাকা থেকে মাত্র চার দিনের ভিসা পেয়ে এসেছিল। আর ফিরে যায়নি দশ বছর। প্রথমে চাকরি করেছে, এখন ব্যাবসা। বছর পাঁচেক আগে একজন কানাডিয়ান মেমসাহেবকে বিয়ে করে অনেক চেষ্টার পরে কানাডার নাগরিকত্ব পায়। এই জন্যে ওই মেমসাহেবকে এক লক্ষ ডলার দিতে হয়েছিল। আগে এটা খুব চালু ব্যাপার ছিল, এখন সরকার বেশ কঠোর হয়েছে। নাগরিকত্ব পাওয়ার পর চুক্তিমতো কানাডিয়ান মহিলার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এখন সে একা আরামে থাকে। বছরে দেশে যায় একবার। বাংলাদেশের ভাল মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। শাহিন ইচ্ছে করেই প্রশ্ন করল না, বকুল সেই ভাল মেয়েদের মধ্যে পড়ে কিনা! করল না কারণ যদি ফুয়াদ হ্যাঁ বলে দেয়!

পরদিন ওদের মাইক্রো বাসে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হল নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখাতে। ফুয়াদও সঙ্গে ছিল। কিন্তু সে গিয়েছিল নিজের গাড়ি চালিয়ে, আনোয়ারভাই বকুল আর বন্যা আপাকে নিয়ে।

ওরা অবাক হয়ে দেখল একটা নদী ভয়ংকর জলপ্রপাত হয়ে নীচে আছড়ে পড়ছে, যার একদিকে কানাডা অন্য দিকে আমেরিকা। নদীর ওপারটা দেখল শাহিন। গোটা পৃথিবীর মানুষ ওই দেশে যেতে চায় রোজগারের জন্যে। নদীর ওপরে ব্রিজ আছে যাতায়াতের জন্য। সে ফুয়াদকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওপারে যাওয়া যাবে?'

হাসল ফুয়াদ, 'মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন। এর সহজ উত্তর হল, হ্যাঁ পারবে, যদি তোমার পাসপোর্টে ইউএসএ গভর্নমেন্টের ভিসা থাকে।'

'এই যে নীচের নদীতে লঞ্চ ভাসছে, ওটায় উঠলেও কি ভিসা লাগবে?'

'না। কারণ ওই লঞ্চ কখনই ওপারে যাবে না।'

'যদি সাঁতরে যেতে পারি?'

'পারাটা প্রায় অসম্ভব, পারলে জেলের খাবার খেতে হবে অনেক বছর।'

একটু মন খারাপ হয়ে গেল শাহিনের। এত কাছে আমেরিকা তবু যাওয়া যাবে না! যেতে পারলে দেশে ফিরে বলা যেত শুধু কানাডা নয় আমেরিকাও দেখে এসেছে।

সবাই যখন নায়াগ্রা দেখবে বলে নীচে নামতে ব্যস্ত তখন শাহিন চুপচাপ রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল। খুব ঠান্ডা এখানে, হাওয়া বইছে জোরে।

'ওপারে যাবেন?'

গলার স্বর এত কাছে যে চমকে মুখ ফেরাতেই লোকটাকে তার থেকে এক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল শাহিন। তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'মানে?'

'খানিক আগে বারবার জানতে চাইছিলেন ওপারে যাওয়া যাবে কিনা, মনে হল আপনি খুব ইন্টারেস্টেড, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।' লোকটা হাসল। রোগা, খাটো, গালভাঙা মুখ, জ্যাকেট পরা লোকটি যে একসময় ফরসা ছিল তা বোঝা যায়!

শাহিন হাসল, 'কিন্তু আমাকে যেতে দেবে কেন? ভিসা থাকতে হবে তো?'

'সেটা তো সোজা পথে। বাঁকা পথেও ঢোকা যায়।' লোকটা হাসল।

'কীরকম?'

'আপনি তো বাংলাদেশের?'

'হ্যাঁ।'

‘বাংলাদেশ আর ভারতের যে সীমান্ত তা পাহারা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রত্যেকটা ফুটের ওপর চোখ রাখা তো সম্ভব নয়। তাই এ দেশের মানুষ ও দেশের হাটে গিয়ে কেনাবেচা করে আসে, ও দেশের মানুষ এ দেশের মাটিতে চাষ করে যায়। তাই তো?’

হ্যাঁ, এরকম গল্প বাংলাদেশের সবাই জানে। বর্ডার ডিস্ট্রিক্টে নাকি কোনও পরিবারের রান্নাঘর ইন্ডিয়ায়, শোওয়ার ঘর বাংলাদেশে পড়েছে।

‘ওপারে যাবেন?’

‘ইচ্ছে হচ্ছে খুব। ভয় নেই তো।’

‘ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছুই নয়।’

‘আপনি সাথে থাকবেন তো?’

‘নিশ্চয়ই। আপনাকে একা ছেড়ে দেওয়াটা বেইমানি করা হবে। একদম বাসে তুলে দিয়ে চলে আসব। আপনি তো খোলা আকাশের নীচে থাকতে পারবেন না। এখান থেকে বাফেলো শহর বেশি দূরে নয়। প্রচুর বাংলাদেশের মানুষ পেয়ে যাবেন সেখানে।’

‘না না। আমি কিছুক্ষণ ওই আমেরিকায় থেকে আবার ফিরে আসতে চাই।’

‘খরচ বেশি পড়বে।’

‘মানে?’

‘এমন কিছু বেশি নয়। এক পিঠের যা খরচ, দু’পিঠ ধরলে তা অনেক কমে যাবে।’

‘এক পিঠের কত?’

‘হাজার।’

‘হাজার মানে? হাজার ডলার?’ প্রায় চিৎকার করে উঠল শাহিন।

‘খুব কম বলেছি। আপনি ভিসা ছাড়া আমেরিকায় ঢুকবেন। ফিরে না এসে মাসে হাজার হাজার ডলার রোজগার করবেন। তার কিছুটা দেশে পাঠিয়ে চারতলা বাড়ি বানাবেন। আমেরিকার এ ডলার আপনার দেশে গেলে কত টাকা হবে তা নিশ্চয়ই জানেন। আর হাজার ডলার তো আমি একা পকেটে পুরছি না, অনেককে ভাগ দিতে হবে। বলুন?’

'আমার কাছে অত ডলার নেই।'

'কত আছে?'

'এখন কিছু নেই। তবে আনোয়ারভাই বলেছেন, কিছু পাব।'

লোকটা আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। হনহন করে হেঁটে দূরের ভিড়ে মিশে গেল।

কানাডায় এসে সিগারেট খেতে খুব কম মানুষকে দেখেছে শাহিন। নায়াগ্রাতেও সিগারেট মেয়েদের হাতেই জ্বলতে দেখল। লাঞ্চের পর ফুয়াদ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি স্মোক করো?'

মাথা নাড়ল সে। না।

'ও। আমি কিছুতেই ছাড়তে পারছি না। চলো, ওদিকে গিয়ে গল্প করি।' দল থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে সিগারেট ধরাল সে। তারপর বলল, 'এবার এই দেশে রাস্তাঘাটেও সিগারেট খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।'

হঠাৎই শাহিন তাকে প্রশ্নটা করল, 'ভিসা ছাড়া আমেরিকায় ঢুকতে কত লাগে?'

হকচকিয়ে গেল ফুয়াদ, 'মানে?'

'একটা লোক একটু আগে এক হাজার ডলার চাইল।'

'তোমার সঙ্গে আলাপ হল কী করে?'

'যেচে এসে কথা বলল।'

'সাবধান। এরা দু'নম্বরি লোক। ডলার নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে।'

'কিন্তু বলছিল আমেরিকায় ঢুকলে মাসে দু'হাজার ডলারের চাকরি পাওয়া যাবে। তা থেকে হাজার ডলার দেশে পাঠালে বাসার চেহারাই বদলে যাবে।'

'তুমি হাজার ডলারের বেশি পাবে না। তোমার ভিসা নেই জানলে ওখানকার দোকানদাররা তোমাকে এক্সপ্লয়েট করবে। আড়াই ডলারের বেশি ঘণ্টায় দেবে না।'

হাজার ডলার মানে সত্তর হাজার টাকা। এখন সে চেষ্টা করলেও মাসে পাঁচ হাজারের বেশি মাইনের চাকরি পাবে না। সত্তরের অর্ধেক

যদি পাঠায় তা হলেও তো অনেক। কিন্তু এখন হাজার ডলার দিতে হবে। সেটা কী করে পাওয়া যায়?

মাথার মধ্যে গোটা দিন এই ভাবনাটা টোকা মেরে গেল। আগামীকাল সাতজন দেশে ফিরছে। পরশু বাকি চারজন। শাহিন আনোয়ারভাইকে বলে নিজেকে দ্বিতীয় দলে রাখতে বকুল কথা শোনাল, 'এসেছিলে একসঙ্গে। যাওয়ার সময়ও সঙ্গে যেতে পারতে। তোমার বদলে যে কেউ একজন পরশু যেতে পারত।'

উত্তর দেয়নি সে। হোটেল ছেড়ে দিতে হল। উদ্যোক্তাদের বাসায় পরশু অবধি থাকবে বাকি চারজন। ফুয়াদ তাকে নিয়ে গেল ওর ফ্ল্যাটে।

ফুয়াদের ফ্লাটটা মাঝারি। দামি ইলেকট্রনিক জিনিসে সাজানো। কিচেন দেখে শাহিন মুগ্ধ। আম্মু স্বপ্নেও এমন পাকঘরের কথা কল্পনা করতে পারবে না। ফুয়াদ যদি এরকম একটা ফ্ল্যাটের মালিক হতে পারে তা হলে সে পারবে না কেন?

'এত সুন্দর ফ্ল্যাটে তুমি একা থাকো?' শাহিন জিজ্ঞাসা করল।

'শনিবার শনিবার একজন বান্ধবী আসে। বাকি দিনগুলোয় সারাদিন খাটুনির পর রাত্রে ঘুমাতে এখানে আসি।'

কফি বানিয়ে এনে ফুয়াদ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কী ভাবছ বলো তো?'

'ভাবছি এরকম সুযোগ আমি কখনও পাব না।'

'কী সুযোগ?'

'এদেশে থেকে রোজগার করার। চার-পাঁচ লাখ টাকা দালালকে দিয়ে তো কখনও আসতে পারব না। পরীক্ষা কবে হবে তার ঠিক নেই। হলেও খুব ভাল ফল না করলে দেশে চাকরি পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। আচ্ছা, এখানে আমি কীরকম চাকরি পেতে পারি?'

'বিশেষ কোনও ব্যাপারে তোমার দক্ষতা আছে?' ফুয়াদ জিজ্ঞাসা করল।

'না।'

'রাঁধতে পারো?'

'না।'

'তা হলে তুমি আনস্কিলড লেবারের চাকরি পাবে। দোকানের সেলসম্যান, রেস্টুরেন্টের বয়। এগুলো দু'দিনেই শিখে নেওয়া যায়।'

পরের দিন সকালে ফুয়াদ তার ব্যাবসার কাজে বেরিয়ে গেল। সারাটা দুপুর আবোল-তাবোল ভেবে গেল শাহিন। যাওয়ার আগে আনোয়ারভাই হিসেব করে তার প্রাপ্য আশি ডলার দিয়ে গিয়েছেন তাকে। নোটগুলো দেখছিল শাহিন। এগুলো কানাডিয়ান ডলার। আমেরিকান ডলারের চেয়ে দাম কম। কিন্তু বাংলাদেশের টাকার চেয়ে অনেকগুণ বেশি দামি। এই আশি ডলার দিয়ে এখান থেকে কী কেনা সম্ভব? যদি ফিরে যেতেই হয় তা হলে দুবাই থেকে যা কেনার কিনবে। আসার সময় সে শুনেছে, ওখানকার ডিউটি ফ্রি শপে সস্তায় জিনিস পাওয়া যায়।

বাড়ি ফিরেই তাকে নিয়ে বের হল ফুয়াদ। গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, 'শেষ পর্যন্ত মন কী বলছে?'

'সত্যি বলছি, ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'বেশ তো থেকেই যাও।' ফুয়াদ স্বাভাবিক গলায় বলল।

নীচে তাকাল শাহিন। 'থেকে যাব মানে? ভিসা ফুরিয়ে গেলে কী করে থাকব?'

'তার রাস্তা আছে। কিন্তু প্রথমে উত্তর দাও, তুমি কেন এদেশে থাকবে?' ফুয়াদ জিজ্ঞাসা করল।

'দেশে আমার মতো যুবকদের সামনে কোনও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। এই পড়াশুনা নিয়ে কোনও চাকরি পাব না। ব্যাবসা করার জন্যে যে-টাকা দরকার তা আমাকে দেওয়ার মতো কেউ নেই। আমি খুব গরিব পরিবারের ছেলে। এদেশে থেকে কি আমি মাসে হাজার ডলার রোজগার করতে পারি, তা হলে আমার আব্বু-আম্মু, ভাইবোন সুখে থাকবে।' শাহিন বেশ জোর দিয়ে বলল।

'তা হলে তো সমস্যা নেই। থেকে যাও।'

'কিন্তু কীভাবে?'

'জনস্রোতে মিশে যাও। তোমার কোনও বৈধ পরিচয়পত্র নেই জানলে

রেস্টুরেন্টের মালিক অথবা বাড়ি তৈরির কনট্রাক্টররা লুফে নেবে। কারণ ন্যায্য রেটের ওয়ানফোর্থ তোমাকে দেবে ওরা। তুমি হুন্ডিতে দেশে টাকা পাঠাতে পারবে। শুধু পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে হবে তোমাকে। অবশ্য পুলিশ যদি জানতে পারে তোমার কথা, তবেই।'

'আমি বুঝতে পারছি না কী করব! পুলিশ যদি ধরে আমাকে জেলে ঢুকিয়ে দেয়।'

'সম্ভাবনা আছে। এদেশে বেশি, আমেরিকায় কম।'

'বুঝলাম না।'

'টরন্টোতে জনসংখ্যা যা তার একটা সামান্য অংশ বাংলাদেশি। তাই এখানে নজরে পড়ে যাওয়া খুব অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু নিউইয়র্কে লক্ষ লক্ষ মানুষ, বাংলাদেশিদের সংখ্যাও অনেক। জ্যাকসন হাইট তো মিনি বাংলাদেশ। ওখানে থাকলে পুলিশের হাতে পড়ার সম্ভাবনা নেই বলতে পারো।'

'কিন্তু আমি সেখানে যাব কী করে?'

'ভাবতে হবে।'

ফুয়াদ গাড়ি পার্ক করল যে বাড়িটার সামনে সেটা যে বিরাট রেস্টুরেন্ট তা বাইরে থেকে বোঝা যায়নি। পার্কিং-এর মেশিনে পয়সা ফেলে ফুয়াদ দোতলায় উঠে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলে প্রচুর মানুষের কথা একসঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে কানে ঢুকল। বার কাউন্টারের কাছাকাছি একটা টেবিলের দখল নিল ওরা। ফুয়াদ বলল, 'আমি একটা বিয়ার ছাড়া কিছু খাব না। গাড়ি চালালে ওর বেশি খাওয়া অন্যায় হবে। তোমার যা ইচ্ছে খেতে পারো।'

'আমি মদ খাই না।'

'কখনও খাওনি বলে বলছ খাও না?'

'হয়তো।'

'তা হলে আমার মতো বিয়ার খাও।'

স্বল্পবাস মহিলা ট্রে নিয়ে ঘুরছিল। তাদের একজনকে ডাকল ফুয়াদ। 'হাই নাদিয়া!' মধ্যবয়সিনী শরীর মুচড়ে হেসে কাছে এল, 'হাই ডার্লিং! কী আনব!'

'দুটো বিয়ার। দু'জনের জন্যে।'

'ব্যস?' চোখ বড় করল নাদিয়া।

'হি ইজ ইন প্রব্লেম। তাই মুড নেই।' ফুয়াদ মেয়েটির পশ্চাৎদেশে মৃদু চাঁটি মারল। একটু বাদেই দুটো বিয়ার এনে টেবিলে রেখে নাদিয়া তাকাল শাহিনের দিকে, 'আমি তোমাকে কী সাহায্য করতে পারি?'

অবাক হয়ে ফুয়াদের দিকে তাকাল শাহিন। ফুয়াদ হেসে নাদিয়াকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওর ভিসা আর কিছুদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। ও এখানে থাকতে চায়। তুমি কি ওকে বিয়ে করতে পারো?'

'ওকে!' মাথা দোলালো নাদিয়া, 'ফর্টি থাউজেন্ড ডলার্স। কিন্তু একসঙ্গে থাকব না। একবছর পরে ডিভোর্স করব। ইট সাউন্ডস ওকে?'

'সো নাইস অফ ইউ। আমি তোমাকে জানিয়ে দেব।' বিয়ারের বোতলে চুমুক দিয়ে ফুয়াদ চেঁচিয়ে বলল, 'আনন্দ!'

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল শাহিন। ফুয়াদ বলল, 'কী হল? চুমুক দাও!'

'চল্লিশ হাজার ডলার বলল ও?'

চলে যাওয়া নাদিয়ার শরীরের দিকে তাকিয়ে বলল শাহিন।

'হুঁ, শাহিনভাই, তা হলে এই পথ তোমার নয়।'

সাত সকালে বেরিয়ে গিয়েছিল ফুয়াদ। তার খুব জরুরি কাজ ছিল। যাওয়ার আগে বলেছিল, 'যদি ফিরে যেতে চাও তা হলে সামনের রাস্তায় ট্যাক্সি পেয়ে যাবে। বিকেল তিনটের মধ্যে বেরিয়ে পড়বে। এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে সময় লাগাবে। আর তোমার কাছে যে ডলার আছে প্রায় পুরোটাই ট্যাক্সিভাড়ায় লেগে যাবে।'

দুপুর পর্যন্ত শুয়ে ছিল শাহিন। এই ডলারগুলো ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দিয়ে শূন্য হাতে প্লেনে উঠতে হবে। ঢাকায় পৌঁছে দেশে যাওয়ার মতো টাকা তার কাছে আছে। কিন্তু গিয়ে কী বলবে সবাইকে? কানাডা দেখে এলাম? কী দেখলে? টরন্টো শহর, নায়াগ্রা জলপ্রপাত। তাতে তোমার কী লাভ হল? তোমার পরিবার কীভাবে উপকৃত হল? এত লোক ওসব দেশে গিয়ে চাকরি ম্যানেজ করে নেয়, তুমি পারলে না। আয়নায়

নিজেকে দেখলে অপদার্থ বলে মনে হয় না?

চারটের সময় ফোনটা বেশ জোরে বেজে উঠল। ধড়মড়িয়ে উঠে রিসিভার তুলে শাহিন বলল, 'হ্যালো!'

'কিছু খেয়েছ?' ফুয়াদের গলা।

'না।'

'ফ্রিজে মুরগির মাংস আর ভাত আছে। ওভেনে গরম করে নাও।' বলে ফোন রেখে দিল ফুয়াদ। তার যাওয়া নিয়ে একটাও কথা বলল না। ফ্রিজ খুলল শাহিন। কাল ফুয়াদকে ওভেন চালু করতে দেখেছিল। সেটা নকল করে খাবার গরম করে নিয়ে গোগ্রাসে খেয়ে ফেলল। পেট ভরে খেয়ে আরাম বোধ করল সে। প্লেনের টিকিটটা বের করে নিজের নাম পড়ল সে। ওই টিকিট কি আজকের পর ব্যবহার করা যাবে? যদ্দিন ভিসা শেষ না হবে, তদ্দিন তো এটা বাতিল নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে ও আগামীকালের প্লেনে সিট পেলে দেশে ফিরে যেতে পারে। হঠাৎ তার মাথায় দ্বিতীয় প্রশ্ন এল, এখন এই টিকিট ফেরত দিলে এয়ার লাইনস টিকিটের দাম থেকে কেটেকুটে কিছু ডলার ফেরত দেবে কি?

ফুয়াদ ফিরল রাত আটটায়। সঙ্গে একটা বড় প্যাকেটে খাবার-দাবার, হুইস্কির বোতল এবং একজন মহিলা। জিনস আর শার্ট পরা মেয়েটি না ফরসা না শ্যামলা। সারা শরীরে বিদেশিনিদের ছাপ মারা।

ফুয়াদ বলল, 'এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম তোমার বন্ধুদের সি-অফ করতে।'

শাহিন অবাক চোখে তাকাল।

ফুয়াদ হাসল, 'ওদের বললাম তুমি একটা ভাল চাকরি পেয়ে গেছ বলে দেশে ফিরে যাচ্ছ না। তোমার বাড়িতে যেন কথাটা ওরা জানিয়ে দেয়। ওহো, আলাপ করিয়ে দিই। এ রিতা, আমার বান্ধবী। এর নাম শাহিন।'

রিতা হাত বাড়াতে শাহিন ওর আঙুল স্পর্শ করল।

পরিষ্কার বাংলা বলল রিতা, 'ভাল করেছ। নইলে ওর বাড়ির লোক চিন্তা করত।'

ফুয়াদ মাথা নাড়ল, 'তুমি এখান থেকে বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিতে পারো।'

শাহিন বলল, 'আমার বাড়িতে ফোন নেই।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ফুয়াদ বলল, 'তা হলে তুমি থেকে গিয়ে ভাল করেছ।'

ফুয়াদের ফ্ল্যাটে দুটো ঘর। সামান্য খাবার খেয়ে অন্যঘরে চলে গিয়েছিল শাহিন। গোটা রাতে ওরা তার খোঁজ করেনি, ও আর ঘরের বাইরে যায়নি।

সকালে রিতা এসে দাঁড়াল দরজায়, 'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং।'

'ভাল ঘুম হয়েছিল?'

'ওই আর কী!'

'টেনশনে ঘুম কম হওয়াই স্বাভাবিক। আসুন, চা করেছি।'

কিচেনের পাশেই ডাইনিং টেবিল। শাহিন ঘরে ঢুকে দেখল ফুয়াদ চা খাচ্ছে। তাকে দেখে হেসে বলল, 'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং।'

রিতা তার দিকে চায়ের কাপ আর বিস্কুট এগিয়ে দিল।

চা খেতে খেতে রিতা বলল, 'কাল আপনার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমি ফুয়াদকে বললাম আপনার উচিত আমেরিকায় চলে যাওয়া।'

ফুয়াদ বলল, 'তোমার দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। রিতা আমেরিকান সিটিজেন।'

'আপনি বাঙালি নন?' জিজ্ঞাসা না করে পারল না শাহিন।

হেসে গড়িয়ে পড়ল রিতা, 'আমাকে বাঙালি বলে মনে হচ্ছে না? আমি একশো ভাগ বাঙালি। তবে বাংলাদেশের মানুষ নই। কলকাতায় জন্মেছি বড় হয়েছি। আমার বাবার টাইটেল ছিল চ্যাটার্জি।'

ফুয়াদ বলল, 'আজ রিতা বাফেলোতে ফিরে যাবে। তুমি ওর সঙ্গে চলে যাও।'

'বাফেলো?' শাহিন ঠিক বুঝতে পারল না।

'নায়াগ্রা ফলস থেকে বেশি দূরে নয়। আমেরিকান শহর।'

'কিন্তু যাব কী করে? সীমান্ত পার হতে তো হবে!'

রিতা হাসল, 'হবে। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

শেষ পর্যন্ত রিতা একাই চলে গেল। বলে গেল দিন চারেক পরে ফিরে আসবে। ভিসা শেষ হয়ে গেছে। শাহিন বাড়ি থেকে বের হয় না।

চারদিনের দিন রিতা ফিরে এল। সেদিন ছুটির দিন ছিল। ব্যাগ থেকে একটা পাসপোর্ট বের করে সে ফুয়াদকে দিয়ে বলল, 'দ্যাখো তো!'

পাসপোর্টের পাতা খুলে সেদিকে তাকিয়ে আবার শাহিনকে দেখল ফুয়াদ। তারপর হেসে বলল, 'আশিভাগ মিলছে। চুলের স্টাইলটা পালটাতে হবে।'

পাসপোর্টটা এগিয়ে দিল সে শাহিনের দিকে। শাহিন দেখল পাসপোর্টটি কোনও এক সুবীরকুমার রায়ের। তিনি ভারতের নাগরিক। সে অবাক হয়ে তাকাতে রিতা বলল, 'উনি গ্রিনকার্ড হোল্ডার। সিটিজেনশিপ দেওয়ার আগে ইউএসএ গভর্নমেন্ট গ্রিনকার্ড দেয়। অলমোস্ট নাগরিক বলতে পারো, শুধু ভোট দেওয়ার রাইট নেই। এই সেই গ্রিনকার্ড। এতে ওই পাসপোর্টের নম্বর আর ছবি আছে।'

'আমাকে কী করতে হবে?'

'তুমি আমেরিকায় ঢোকা পর্যন্ত এখন থেকে সুবীরকুমার রায়। ঠিকানাটা মুখস্থ করে ফেলো। থাকো নিউইয়র্কে। নিউইয়র্কের ঠিকানা তোমাকে বলে দেব। একদম নার্ভাস হবে না। জিজ্ঞাসা করামাত্র ঝটপট বলবে।'

'ওখানে যাওয়ার পরে এটা ফেরত নেবেন?'

'হ্যাঁ। তখন তুমি আবার শাহিনভাই।'

'যদি ছবির সঙ্গে মিলিয়ে সন্দেহ করে—!'

'করবে না।'

সন্ধে সাতটা নাগাদ টরেন্টো থেকে রওনা হয়েছিল ওরা। ফুয়াদ তার কার্ড এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'মাঝে মাঝে ফোন কোরো। আর, হ্যাঁ, তোমার পাসপোর্ট কোথায়? ওটা সঙ্গে রেখো না, দাও।'

'কেন?'

'দুটো পাসপোর্ট থাকলে জেলে যেতে হবে।'

শাহিন নিজের পাসপোর্ট বের করে ফুয়াদকে দিয়ে দিল। গাড়ি চালাচ্ছিল রিতা। শাহিন তার পাশে বসে। যেতে যেতে রিতা বলল, 'একটা কথা মনে রেখো। তুমি আজই টরেন্টোতে এসেছিলে। ফুয়াদের সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাচ্ছ।'

মাথা নেড়েছিল শাহিন। ইতিমধ্যে সুবীরকুমার রায়ের ঠিকানা মুখস্থ হয়ে গেছে তার। চোখ বন্ধ করে বসে ছিল সে। রিতা জিজ্ঞাসা করল, 'কী, নার্ভাস লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'দুর! বি স্মার্ট। নার্ভাস হয়েছ বুঝতে পারলেই ওরা সন্দেহ করবে।'

শেষ পর্যন্ত নায়াগ্রা ফলসের কাছে এসে গাড়ি থামাল রিতা। বাঁ দিকে ইমিগ্রেশন অফিস। থামিয়ে বলল, 'আমাকে জড়িয়ে ধরে বসো। জলদি।'

শাহিন কোনওমতে রিতার কাঁধে হাত রাখল। রিতা চাপা গলায় বলল, 'আরও ক্লোজ হও। আসছে।'

শাহিন দেখল একজন প্রৌঢ় অফিসার এগিয়ে এসে উঁকি মারল, 'হাই!'

'হাই!' রিতা হাসল। তারপর ডান হাতে ব্যাগ খুলে নিজের পাসপোর্ট এগিয়ে দিল। অফিসার তার পাতা খুলে বলল, 'ইউএস সিটিজেন?'

'ইয়া। ডার্লিং, শো ইয়োর কার্ড!'

শাহিন হাত সরিয়ে নিয়ে বুক পকেট থেকে কার্ড বের করে অফিসারকে দিল। অফিসার বলল, 'গ্রিনকার্ড!' তারপর ছবি খুলে মেলাতে চাইল।

রিতা বলল, 'কয়েকদিনের জ্বরে ওজন কমে গেছে ওর।'

'আর ইউ শিয়োর?' অফিসার চোখ ছোট করল, 'হোয়াট ইজ ইয়োর ইন্ডিয়ান অ্যাড্রেস?'

শাহিন গড়গড় করে বলে ফেলল।

'তুমি কবে কানাডায় এসেছ?'

'আজ।'

'কেন?'

'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।'

'ফোন নম্বর কী?'

শাহিন ফুয়াদের দেওয়া কার্ড এগিয়ে দিল। সেটা পড়ে মাথা নেড়ে পাসপোর্ট এবং গ্রিনকার্ড ফেরত দিয়ে অফিসার বলল, 'হ্যাভ এ নাইস জার্নি!' বলামাত্র রিতা চেঁচিয়ে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে গাড়ি চালু করল।

এপারে আসার পর খেয়াল হল শাহিনের। অফিসার ফুয়াদের কার্ডটা ফেরত দেয়নি। রীতা মোবাইলের বোতাম টিপল, 'পার হয়ে এসেছি। কিন্তু তোমার দেওয়া কার্ডটা অফিসার নিয়ে রেখেছে। হ্যাঁ, ওকে।'

বাফেলো শহরের একটা ম্যাকডোনাল্ডে ওরা যখন ঢুকল তখন রাস্তা জনশূন্য, দোকানেও দু'-তিনজন ছাড়া খদ্দের নেই। রিতা বলল, 'নিশ্চয়ই তোমার খুব খিদে পেয়েছে! খেয়ে নাও, এখান থেকে নিউইয়র্ক পৌঁছাতে অন্তত আট ঘণ্টা লেগে যাবে।'

চিকেন, আলুভাজা এবং কোক কিনে একটা টেবিলে বসল রিতা। খাওয়া শুরু করে বলল, 'তা হলে তুমি এখন আমেরিকায়। খুব বোকামি যদি না করো তা হলে পুলিশ তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না।'

'বোকামি ম্মানে?'

'কারও সঙ্গে মারপিট করলে, মদ খেয়ে মাতলামি করলে অথবা কোনও মেয়ে যে তোমাকে পছন্দ করছে না তাকে বিরক্ত করলে—!'

'এর কোনওটাই আমি করব না।'

'গুড!' কোকে চুমুক দিয়ে রিতা বলল, 'তোমাকে আমি এখন গ্রে-হাউন্ড বাসে তুলে দেব। তোমার কানাডিয়ান ডলারগুলো আমাকে দিয়ো, আমি এদেশের ডলার দিয়ে দেব। রাস্তায় মাঝে মাঝে বাস থামবে কিন্তু টয়লেটের দরকার না হলে তুমি নেমো না। নিউইয়র্কের পোর্ট অথরিটি টার্মিনাল পৌঁছে তুমি একটা নম্বরে ফোন করে নিজের পরিচয় দিয়ে বলবে রিতা পাঠিয়েছে। ওকে?'

'তারপর?'

'টেলিফোনে যেমন নির্দেশ পাবে তেমন করবে।'

‘কীভাবে টেলিফোন করে এখানে?’

‘আমি তোমাকে কয়েন দিয়ে দেব। নম্বর লিখে দেব। পোর্ট অথরিটির ভেতর শ’খানেক টেলিফোন পাবলিকের জন্য আছে।’

‘তুমি এখন কোথায় যাবে?’

‘আমার ফ্ল্যাটে। মিনিট কুড়ি দূরে।’

‘তুমি কি একাই থাকো?’

‘আপাতত। আমি ডিভোর্সি।’

চল্লিশ মিনিট পরে শাহিন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গ্রে-হাউন্ড বাসের নরম সিটে বসে কাচের বাইরে অন্ধকার পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ছিল। বুকের ভেতর তিরতিরে ভয় হামাগুড়ি দিচ্ছে। টিকিট কেটে বাকি ডলারগুলো ফেরত দিয়ে রিতা বলেছিল, ‘উইশ ইউ গুড লাক। এবার সুবীরকুমার রায়ের পাসপোর্টটা আমাকে দাও।’

ফেরত দিয়ে শাহিন বলল, ‘আপনার উপকার আমি চিরদিন মনে রাখব।’

‘উপকার? দুর। আমি তোমাকে সাহায্য করেছি বলতে পারো। আর তুমি তো বিনা পয়সায় সাহায্য নাওনি, তার দামও দিয়েছ।’ রিতা হাসল।

‘আমি দাম দিয়েছি?’ অবাক হয়ে গেল শাহিন।

‘তোমার নিজের পাসপোর্ট যেটা ফুয়াদকে দিয়ে এলে। ওটা যে কত কাজে লাগবে তা তুমি ভাবতে পারবে না। যাও উঠে পড়ো। বাই।’

বাসে বসে অনেকক্ষণ,কিছু ভাবতে পারছিল না শাহিন। রিতা এবং ফুয়াদ তাকে আমেরিকায় আসতে সাহায্য করেছে। কিন্তু তার বদলে যে পাসপোর্টটা কাজে লাগাবে ভাবতে পারেনি। কীভাবে কাজে লাগাবে তা সে বুঝতে পারছে না। ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় ওটার কী মূল্য থাকতে পারে! এখন তার পকেটে রিতার বদলে দেওয়া কিছু আমেরিকান ডলার ছাড়া বাসের টিকিট রয়েছে। পাসপোর্ট দূরের কথা, কোনও পরিচয়পত্র নেই। কাল যদি রিতার লোকটাকে সে ফোনে ধরতে না পারে তা হলে কী করবে? কোথায় যাবে? হঠাৎ নিজের ওপর খুব রাগ হল। কেন সে দেশে ফিরে গেল না! তা হলে এমন

ভয়ংকর শূন্যতার মধ্যে থাকতে হত না। রাত যত এগোতে লাগল, বাস যত নিউইয়র্ক শহরের দিকে ছুটতে লাগল, তত হাত-পা ঠান্ডা হতে লাগল তার। বাসে এখন যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। এর মধ্যে দু'জায়গায় বাস থেমেছে, লোকে ওঠা নামা করেছে কিন্তু সে সিট ছেড়ে ওঠেনি। একসময় ঝিমুনি এল। চোখ যখন খুলল তখন রাত ফুরিয়ে এসেছে। একটা বিশাল শহরে বাস ঢুকছে। এটাই কি নিউইয়র্ক? সোজা হয়ে বসল সে। না, যেমন করে হোক তাকে লড়াই করতেই হবে। হেরে যাওয়ার আগে কিছুতেই সে হারবে না।

স্নান সেরে পরিষ্কার করে দাড়ি কামিয়ে ভাল শার্ট পরে ঘর থেকে বের হল শাহিন। পাসপোর্ট না থাক জো-এর দেওয়া পরিচয়পত্র তো আছে।

কয়েক মিনিট হাঁটার পর আলোয় ঝলমল করা সমুদ্রসৈকত দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। একেবারে দিনের আলোয় সেজেছে সি-বিচ। প্রচুর মানুষ এখন ওখানে। ক্রমশ সেই মানুষের মেলায় মিশে গেল সে। ছোট ছোট দোকান বসেছে বালির ওপর। পিছনে বড় রেস্টুরেন্টগুলো। হঠাৎ কানে এল, 'পরোটা কারি, পরোটা কারি।' সে লক্ষ করল একটি ছেলে ভ্যানের পেছনে দোকান বানিয়ে ওইভাবে চেঁচাচ্ছে। সে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটির মুখ চোখ দেখে বুঝতে পারল ও এদেশের তো নয়ই, মেক্সিকানও নয়।

পরোটা এবং আলুর দম দেখে মন এত ভাল হয়ে গেল যে শাহিনের মুখ থেকে বাংলা শব্দ বেরিয়ে এল, 'কত দাম?' বলেই খেয়াল হতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'হাউ মাচ?'

ছেলেটা চিৎকার থামিয়ে একগাল হাসল, 'আপনি বাঙালি?'

কানে মধুবর্ষণ হল শাহিনের, সে বলল, 'হ্যাঁ।'

'পরোটা দু'টা দিই?' সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটা কাগজের বাক্সে দুটো পরোটা আলাদা ভাঁজ করে তার একপাশে আলুর দম ঢেলে দুটো পেপার ন্যাপকিনের সঙ্গে এগিয়ে ধরল ছেলেটা।

'কিন্তু দামটা বললেন না ভাই।'

'আরে মিঞা, আগে খান তো! আমার নিজের হাতে তৈরি। ওদের কাছে আমি দুই ডলার নিতাম, আপনি এক ডলার দেবেন।' বলেই ছেলেটা আবার চিৎকার করল, 'পরোটা কারি, পরোটা কারি।'

রান্না চমৎকার। পরোটাও নরম। দুটোতেই পেট ভরে গেল শাহিনের।

'পানি চাই?'

শাহিন মাথা নাড়তে একটা জলের বোতল এগিয়ে দিল ছেলেটা, 'বলেন মিঞা, কোন জিলা?'

'ফরিদপুর।'

'আমি মৈমনসিং। ট্যুরিস্ট নাকি?'

'না। ট্রান্সপোর্টে চাকরি পেয়েছি। এই প্রথম এখানে আসা?'

'কোথায় উঠছেন?'

'একটা মোটেলে।'

'অ। এক কাম করেন, এক ঘণ্টায় যা পারেন দেখে নেন। এক ঘণ্টা পরে এখানে আসবেন।'

একটা ডলার ছেলেটার হাতে দিয়ে হাঁটতে লাগল শাহিন? এত রাতেও মানুষ আনন্দ করছে। গান শুনছে। এখানে এসে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে দুঃখ বলে কিছু নেই।

এক ঘণ্টা পরে ফিরে এসে শাহিন দেখল দোকান গুটিয়ে নিয়েছে ছেলেটা। হেসে বলল, 'চলেন।'

'কোথায়?'

'আমার বাসায়।'

'এত রাত্রে?'

'দুর মিঞা, এখানে দিন রাত এক। চলেন। দু'রকম ভর্তা আছে। চিংড়ি আর আলু। সঙ্গে মেনি মাছ।'

মেনি মাছের নাম শুনে পুলকিত হল শাহিন। বলল, 'এখানে যে মেনি মাছ পাওয়া যায় তা জানতাম না।'

'সব পাওয়া যায়। ওঠেন।'

ভ্যানের ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে বসে শাহিন জিজ্ঞাসা করল,

'আচ্ছা, আপনি যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, চেনেন না জানেন না, নামও জিজ্ঞাসা করেননি।'

'আপনি বাঙালি, আমি বাঙালি। এইটাই তো আসল কথা। আমার নাম আলি। আপনার নামটা বলেন।'

'শাহিন।'

'ব্যস। সমস্যার শেষ।'

আলি একা থাকে না। তার রুম পার্টনার একজন পাকিস্তানি ছেলে। তার ডিউটি রাত দশটা থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত। সে যখন ফেরে তখন আলি বেরিয়ে যায়। একটা আট বাই দশ ঘর। বাথরুম-কিচেন আছে।

শাহিন জিজ্ঞাসা করল, 'পাকিস্তানির সঙ্গে থাকতে পারছেন?'

'মিরজাফর মুসলমান ছিল সেই কারণে সব মুসলমান কি মিরজাফর? সেই মতো পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ তো কোনও অন্যায় করে নাই, করছে তাদের নেতারা। অবশ্য আমি আর একটা মজা পাই।'

'কী?'

'প্রাণখুলে গালাগালি দিই। ওর বাপ-ঠাকুরদা আমাদের দেশের মানুষের ওপর অত্যাচার করছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় হাজার হাজার বাঙালিকে খতম করছে, তাই ওরে গালাগালি দিতে বেশ আরাম লাগে।'

ভাত খেতে হল। অনেকদিন পরে দেশের রান্না খেয়ে খুব মজা লাগল শাহিনের। খাওয়া শেষ হওয়ার পর ওকে পৌঁছে দিতে এল আলি।

অনেকক্ষণ ধরে কথাটা মনে পাক খাচ্ছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল শাহিন, 'আপনি দেশে শেষ কবে গিয়েছেন?'

'আসার পর আর যাই নাই।'

'কেন?'

'আমার তো পাসপোর্ট নাই।' হাসল আলি।

চমকে তাকাল শাহিন, 'অসুবিধা হয় না?'

'ওই, একটাই অসুবিধা। দেশে যাওয়া যাবে না তাই মন খারাপ হত। এখন হয় না। আট বছর তো আছি। ইনসাল্লা, ভালই আছি।'

'পুলিশ আপনাকে কখনও ধরেনি?'

'আমি কখনও অন্যায় করিনি। না করলে পুলিশ আমাকে ধরবে কেন?'

'কাগজপত্র ছাড়া যে এদেশে আছেন—!'

'যদি তার জন্য পুলিশ ধরে ধরবে। ধরে কী করবে? কোর্টে তুলবে। কোর্ট পাঁচ বছরের জেল দেবে। জেল থেকে বেরোবার পরে যদি এরা দেশে পাঠিয়ে দেয় তো চলে যাব! কিন্তু বুঝলেন, আমাকে পুলিশ ধরবে না।'

'কেন?'

'আমার বড় ভাই এই দেশের সিটিজেন। সে ডাক্তার। একবার তার খুব অসুখ হল। তাকে দেখতে আসার জন্যে ঢাকার আমেরিকান অফিসে গিয়ে ভিসা চাইলাম। ওরা অনেক ভেবে মাত্র সাতদিনের জন্যে ভিসা দিল। আমি বড় ভাইকে দেখে ফিরে গেলাম না। তিনি চাইছিলেন যে ফিরে যাই। আমি আমার পাসপোর্ট ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলে কমোডের পানিতে ভাসিয়ে দিলাম।'

'সেকী!'

'হ্যাঁ। তারপর থানায় গিয়ে ডায়েরি করলাম, পকেটমারি হয়ে গেছে। ওরা কাগজ দিল। তাই নিয়ে বাংলাদেশের দূতাবাসে গিয়ে আবার পাসপোর্ট চাইলাম। তারা বলল, দেশ থেকে আমার সম্পর্কে খবর পেলে পাসপোর্ট ইস্যু করবে। আমার আবেদনে স্বীকৃতি দিয়ে একটা কাগজও দিল। সেটা নিয়ে গেলাম আমেরিকান ইমিগ্রেশন অফিসে। যতদিন দেশ থেকে পাসপোর্টের অনুমতি না পাচ্ছি ততদিন খাব কী? ওরা সব দেখে আমাকে টেম্পোরারি কাজ করার অনুমতি দিল। একটার পর একটা কাজ করার পর এখন পরোটা কারি বিক্রি করি।'

'পাসপোর্ট দিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস?'

'জানি না। আর খোঁজ করিনি। করলে তো দেশে ফিরে যেতে হত।'

'কিছু মনে যদি না করো, এখন তোমার ইনকাম কত?'

'সব খরচ বাদ দিয়ে দেড় থেকে দু'হাজার।'

'এত?'

'তাই বলে তুমি আমার লাইনে এসো না?'

মোটেলের সামনে শাহিনকে নামিয়ে হাত মেলাল আলি। 'আশা করি আমাকে মনে রাখবে। এখানে এলে সোজা আমার কাছে চলে যাবে।' 'মেরিন হাট'-এর' সামনে মধ্যরাত্রে একা দাঁড়িয়ে আলির চলে যাওয়া দেখল শাহিন।

দু'বছর কাজ করেছিল শাহিন ইউনাইটেড ক্যারিয়ার্সে। জো তাকে থাকার জন্য একটা ঘর দিয়েছিল গ্যারেজের ওপরে। কিন্তু মাসের পঁচিশটা দিন তাকে থাকতে হত ট্রাকের কেবিনে। ওটাই তার ঘর বাড়ি হয়ে গিয়েছিল। দেশে টাকা পাঠায় সে নিয়মিত। টাকার পরিমাণও বাড়ছিল। দেশে ফোন করলে মেজভাই কথা বলত। সে নাকি একটা কাজ পেয়েছে শহরে। মোবাইল ফোনটা নিজের কাছেই রাখে। বিরক্ত হয়ে শাহিন বলেছিল, 'আর একটা ফোন আব্বুকে কিনতে বল।' মেজভাই বলেছিল, 'বলব।' কিন্তু আব্বু ফোন কেনেনি। কিছুতেই ওদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছিল না শাহিন। যা বলার তা মেজভাই-এর মাধ্যমে বলতে হচ্ছিল।

ওইরকম সময়েই ঘটনাটা ঘটল। ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর হয়ে নিউইয়র্কে ফিরছিল ট্রাক। এবারের ড্রাইভার একটি কালো ছেলে। কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে বিয়ার খেতে খেতে গাড়ি চালাচ্ছিল। এই লোকটির সঙ্গে আগে কখনও ডেলিভারি দিতে যায়নি শাহিন। ওয়াশিংটন শহর ছাড়াতেই সে আপত্তি জানিয়েছিল, 'আমার মনে হয় তোমার একটার পর একটা বিয়ার খাওয়া ঠিক হচ্ছে না।'

লোকটা যেভাবে হাত ছুড়ে বিরক্তি প্রকাশ করল তার মানে এই দাঁড়ায়, গোল্লায় যাও। মেঘ ছিল। টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হল। ওরা বেরিয়েছিল রাত দশটা নাগাদ। ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যে নিউইয়র্কে পৌঁছে যাওয়ার কথা। লোকটা যখন চার নম্বর ক্যানটা খুলল তখন পিছনের কেবিনে গিয়ে জো-কে ফোন করে ব্যাপারটা জানাল সে। জো বলল, 'তুমি বাকি ক্যানগুলো রাস্তায় ফেলে দাও।'

'ও মারপিট করবে। বৃষ্টি বাড়ছে। কী করব?'

'ওকে বলো তুমি টয়লেটে যাবে। একজিট দিয়ে কোনও রেস্টুরেন্টে

চলে যাও। টেক টাইম। যদি ও ঘুমিয়ে পড়ে ঘুমোতে দাও। যখন ঘুম ভাঙবে তখন আশা করি নেশাটা থাকবে না।' জো ফোন রেখে দিল।

সামনের সিটে গিয়ে শাহিন চিৎকার করে বলল সে টয়লেটে যাবে।

লোকটা তাকাল, 'কেন? এতক্ষণ কী করছিলে?'

'আমি যা বললাম তাই করো।'

'কেন? তুমি কি আমার বস?'

ঝগড়া করে কোনও লাভ হবে না। কথা বলতে বলতে ট্রাক একবার লেন পরিবর্তন করেছে। পিছনের গাড়ি হর্ন দিয়েছে। এ দেশে অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা না থাকলে কেউ হর্ন দেয় না। সে শান্ত গলায় বলল, 'প্লিজ, পাঁচ মিনিটের জন্যে চলো, নইলে এখানে সব নোংরা হয়ে যাবে।'

গালাগাল দিতে দিতে এগজিট ধরে হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। খানিকটা যাওয়ার পর একটা ফুডজয়েন্টের পার্কিং লটে ট্রাক দাঁড় করিয়ে বলল, 'যত তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো।'

ট্রাক থেকে নেমে ধীরে সুস্থে হাঁটছিল শাহিন বৃষ্টির মধ্যে। লোকটা চেঁচাল, কী বলল স্পষ্ট বোঝা গেল না। ফুডজয়েন্টের ভেতরে গিয়ে আবার জো-কে ফোন করে সব জানাল সে। জো বলল, 'একটা কফি নিয়ে আড়ালে বসো। যেন তোমাকে ও না দেখে ফেলে। ও নেমেছে ট্রাক থেকে?'

'না।'

কফি কিনে একটা আড়াল খুঁজে নিয়ে ধীরে-সুস্থে খেল শাহিন। মাত্র আট মিনিট কাটল। এতে ওই লোকের ঘুম পাওয়ার কথা নয়। হঠাৎ বাইরে পুলিশের গাড়ির সাইরেন বেজে উঠল। তিনটে গাড়ি একসঙ্গে এসে দাঁড়াল পার্কিং লটে। শাহিন অবাক হয়ে দেখল তিনজন অফিসার রিভলভার উঁচিয়ে তাদের ট্রাকের সামনে গিয়ে ড্রাইভারকে নেমে আসতে বলছে। প্রতিবাদ করতে করতে লোকটা নীচে নামতেই একজন অফিসার তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। লোকটাকে একটা পুলিশের গাড়িতে তুলে দিয়ে ট্রাকের ভেতরটা ভাল করে দেখল ওরা। এই সময় চতুর্থ অফিসার নেমে এল তিন নম্বর গাড়ি থেকে। নিজেদের মধ্যে কথা

বলে চতুর্থ অফিসার ট্রাকে উঠে বসল। চোখের সামনে দিয়ে তিনটে পুলিশের গাড়ি আর ট্রাকটা হাইওয়ের দিকে চলে গেল।

দ্রুত জো-কে ফোন করল শাহিন। শুনে জো উত্তেজিত, 'ডেলিভারির চালানগুলো কোথায়? গাড়িতে রেখে নেমেছিলে?'

'না। আমার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে আছে।'

'ও, ভগবান! বাঁচালে!'

'এখন কী করব?'

'নিশ্চয়ই ড্রাইভার হাইওয়েতে আইন ভেঙেছিল। তুমি আর ট্রাকের খোঁজে না গিয়ে সোজা নিউইয়র্কে চলে এসো।'

এই সময় পার্কিং লটের দায়িত্বে থাকা একজন সিকিউরিটি গার্ড বেশ উত্তেজিত গলায় বলল, 'আট-দশ বছরের আগে ছাড়া পাবে না।'

একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছিল বলো তো?'

'কী আর হবে! ড্রাইভার ড্রাগ ক্যারি করছিল। এখন পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গিয়ে লোডেড মাল চেক করে দেখবে সেখানে কোনও বে-আইনি মাল আছে কিনা!'

শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল শাহিনের। ড্রাইভারের কাছে ড্রাগ ছিল? সে যদি এখন ট্রাকে থাকত তা হলে পুলিশ তাকে জড়িয়ে ফেলত। তার ওপর যখন জানত এদেশে সে বে-আইনি ভাবে আছে তা হলে তো কোনও কথাই শুনত না। সে চটপট ভেবে নিল। না, ট্রাকে তার নাম লেখা কোনও কাগজ নেই। ড্রাইভার যদি পুলিশকে তার কথা বলে তা হলে নাম বলতে পারবে না। একমাত্র কোম্পানির কাছে পুলিশ জানতে পারবে যে সে ট্রাকে ছিল।

সে আবার জো-কে ফোন করে ড্রাগের কথা জানাল।

'লুক, শান, তুমি ওই চালানগুলো যেমন করে হোক নিউইয়র্কে নিয়ে এসো। আমি আমাদের উকিলের সঙ্গে কথা বলছি। তুমি যে ওই ট্রাকে ছিলে তা আমরা স্বীকার করব না। বলব ড্রাইভার একাই আসছিল ট্রাকটা নিয়ে। তোমার এখানে আসার দরকার নেই। দিয়াগোর দিদির রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমাদের ফোন করবে।'

শাহিন বুঝতে পারছিল না কেন জো পুলিশকে বলবে ট্রাকে

ড্রাইভার ছাড়া তাদের কোনও লোক ছিল না। এটা যে সত্যি নয় তা ওয়াশিংটনের গ্যারাজে খোঁজ করলে পুলিশ জানতে পারবে। তা ছাড়া হঠাৎ তাকে বাঁচাতে চাইছে কেন জো? ভাবতে না ভাবতে আবার জো-এর ফোন এল, 'সরি। আমরা স্টেটমেন্ট চেঞ্জ করছি। তুমি ওয়াশিংটন থেকে কোম্পানির মাল নিয়ে ট্রাকে উঠেছিলে। ঘণ্টাখানেক চলার পরে একটা ফুড জয়েন্টে ট্রাক থামলে তুমি টয়লেটে যাও। ফিরে এসে দ্যাখো তোমাকে ফেলে ড্রাইভার ট্রাক নিয়ে চলে গেছে। একথা তুমি আমাদের টেলিফোনে জানিয়েছ। ওকে?'

কিছু বলার আগে লাইন কেটে গেল।

মাঝে মাঝে শাহিনের মনে হত, যে সব প্যাকেট ডেলিভারি দিতে যাচ্ছে তার হিসেবে গরমিল আছে। চালানে যা দেখানো হত তার চেয়ে অনেক বেশি ট্রাকে লোড করা হত। এখানেই চুরির সম্ভাবনা ছিল বলে ওদের একজন বিশ্বস্ত লোকের দরকার হয়েছিল। ওই বাড়তি বাক্সে বে-আইনি বস্তু থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু ওরা তাকে ঠিকঠাক ডলার দিত বলে সে এতদিন এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। আজ চালান না পেলে পুলিশ বুঝতে পারবে না বাড়তি প্যাকেট ছিল কিনা। প্যাকেট খুলে বে-আইনি কিছু পেলে দায়িত্ব অস্বীকার করবে। বলবে তাদের লোককে ট্রাক থেকে নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার রাস্তার কোথাও থেকে ওই বাক্স তুলেছে।

এখন এই রাত-দুপুরে কীভাবে সে নিউইয়র্ক যাবে? এতক্ষণ এখানে আছে কিন্তু কোনও বাসকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে এখানে ঢুকতে দেখেনি। বেশির ভাগ মানুষ আসছে নিজের গাড়ি নিয়ে। প্রয়োজন শেষ হলে চলে যাচ্ছে। কাছাকাছি কোথাও কি গ্রে-হাউন্ড বাস স্টেশন আছে? তারপরেই হেসে ফেলল সে। এতগুলো বছর এদেশে কাটিয়েও তার মন থেকে দেশের আড়ষ্টতা গেল না। টেলিফোন বক্সের সামনে গিয়ে অপারেটারকে চাইল সে। মহিলা লাইনে এলে সে জায়গাটার নাম বলে জানাল একটা ট্যাক্সি দরকার। মহিলা তাকে ট্যাক্সি ইউনিয়নের নম্বর দিলেন। পয়সা ফেলে সেখানে যোগাযোগ করে বলতেই শুনল পাঁচ মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি এসে যাবে।

ঠিক সাড়ে চার মিনিটে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতেই শাহিন ছুটে গিয়ে দরজা খুলে উঠে পড়ল, 'গ্রে-হাউন্ড বাস স্টেশন, প্লিজ।'

'হুঁ হুঁ', কালো ড্রাইভার মাথা নাড়ল।

বেশি সময় লাগল না। কিন্তু এরকম বৃষ্টির রাত্রে ভিলেজ রোড দিয়েও হেঁটে আসা যেত না। কুড়ি ডলার বেরিয়ে গেল পকেট থেকে। গ্রে-হাউন্ড বাস স্টেশনের ভেতরটা একদম ফাঁকা। কাউন্টারে একটা সাদা রোগা ছেলে কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে নেচে যাচ্ছে। পোর্ট অথরিটির টিকিট কাটল সে। তারপরই তার খেয়াল হল। আজকাল আর সেই ভয়টা তেমন ভাবে ছোবল মারে না। এই যে সে ট্যাক্সিতে এল, এত রাত্রে স্টেশনে ঢুকে টিকিট কাটল, একবারও পুলিশের কথা মনে পড়েনি। উলটে সে বুঝতে পারে অন্যান্য আমেরিকানদের মতো তার কথা বলার ভঙ্গিতে, চালচলনে, এমনকী খাওয়া-দাওয়াতেও আগের বাংলাদেশের ছাপটা নেই। না, সে পর্ক অথবা হ্যাম ছুঁয়েও দেখে না কিন্তু একটা রাশিয়ান স্যালাড আর বিয়ার নিয়ে ছুটির দুপুরটা দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারে। ভাতের জন্য মন আর এখন টনটন করে না।

এই সময় তিনজনের একটা দল স্টেশনে ঢুকল। দু'জন মহিলা একজন পুরুষ। ওরা বাংলায় কথা বলছে। ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ইংরেজিতে, 'এখান থেকে নিউইয়র্কে যাওয়ার বাস পাওয়া যাবে বলে শুনেছি। কখন পাওয়া যাবে?'

'এক ঘণ্টা অন্তর আসে।' বাংলায় বলল শাহিন।

'আরে! আপনি বাঙালি? অ্যাই শোনো, ইনি বাঙালি।'

একটু বেশি বয়স যাঁর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইন্ডিয়ার?'

'না, বাংলাদেশের। ফরিদপুর জেলা।'

'আমরা যশোর। আমার জামাই পাবনার। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'নিউইয়র্কে।'

'আমরা নিউইয়র্ক থেকে এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। দেশে ফিরে যাব তিনদিন পরে। আপনি কি অনেকদিন আছেন? ও হো, এ আমার বোন।'

মাথা নেড়ে শাহিন বলল, 'অনেকদিন আছি।'

'বাসায় কে আছেন?'

'এখানে আমি একা। দেশে সবাই আছেন।'

'বউ কোথায়?'

'না। এখনও আমি আনম্যারেড!' হেসে ফেলল শাহিন।

ভদ্রলোক টিকিট নিয়ে এলেন। যশোরে বাড়ি কিন্তু ব্যাবসা করেন ঢাকায়। এই প্রথম বিদেশে এসেছেন ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে। পরিচয় দেওয়া-নেওয়া হল।

'কী করে ভিসা পেলেন?' জিজ্ঞাসা না করে পারল না শাহিন।

'আমার ব্যাবসা, জমিজমা, বাড়ি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দেখে ওদের সন্দেহ হয়নি যে ওসব ছেড়ে এদেশে থেকে যাব। তাই দিল। যাই বলুন, এখানে লোকে খুব কষ্ট করে থাকে। ঝি-চাকর নেই, সব কাজ নিজেকে করতে হয়, টাকা রোজগার করে যদি সুখ না পাই তা হলে পরিশ্রমের কোনও মানে হয় না।' ভদ্রলোক বললেন, 'এখানে লোকে একদিন রান্না করে, তিনদিন খায়। দেশে এটা ভাবতেই পারি না।'

শাহিন লক্ষ করছিল ভদ্রলোকের শ্যালিকা কোনও কথা বলছিল না। বছর উনিশ-কুড়ির মেয়েটিকে দেখতে বেশ মিষ্টি।

বাস এল। দু'জন লোক নামল। টিকিট পাঞ্চ করে ওরা ওপরে উঠল। বাস ফাঁকা। দুই মহিলা ছেলেমানুষের মতো দুটো জানলার গায়ে গিয়ে বসলেন। বয়স্কা মহিলা স্বামীকে বললেন, 'তুমি এখানে বসো।'

ভদ্রলোক আদেশ মান্য করলেন। শাহিন ইচ্ছে করে মেয়েটির ওপাশের সিটে বসল। মাঝখানে যাতায়াতের প্যাসেজ। দু'দিকে দুটো করে সিট। বাস চলা শুরু করল। শাহিন ভাবছিল এবার কী হবে? পুলিশ কি জো-কে বলবে তার সঙ্গে কথা বলতে চায়? সেরকম হলে সে কিছুতেই পুলিশের কাছে যাবে না। আর সেই কারণে যদি তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় তা হলে আবার সমস্যায় পড়বে সে। আজ অনেকদিন পরে আলির কথা মনে পড়ল শাহিনের। আলি যদি পরোটা কারির ব্যাবসা করতে পারে তা হলে সে কেন পারবে না?

'আপনি নিউইয়র্কে কোথায় থাকেন?'

'কুইন্সে।' মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল শাহিন।

'আমরাও কুইন্সে যাব। জ্যাকসন হাইটে।'

'কেমন লাগছে আমেরিকা?'

মাথা নাড়ল মেয়েটি। আবছায়াতেও সেটা বোঝা গেল।

'কেন?'

'খুব নির্জন। দেখে মনে হয় এখানকার মানুষরা খুব একা।'

হাসল শাহিন, 'ঠিক বলেছেন।'

'আমাকে আপনি বলবেন না। আমি অনেক ছোট।'

'বেশ, তোমাকে যদি এদেশে থাকতে বলা হয় কী করবে?'

'অসম্ভব। আমি কখনওই এখানে থাকব না। আমার দেশ অনেক ভাল।'

'তুমি একথা বলছ, অথচ আমাদের দেশের ছেলেদের অধিকাংশ এখানে আসার সুযোগ পেলে খুশি হবে। এই যেমন আমি এখানে আছি।'

'আমি জানি না কেন আছেন। হয়তো কারণ আছে। আমি থাকব না।' বলে মেয়েটি বাঁ দিকের জানলায় মাথা রাখল।

শ্বাস ফেলল শাহিন। তারপর চোখ বন্ধ করল।

পোর্ট অথরিটিতে বাস পৌঁছাল সকাল পাঁচটায়। ভদ্রলোক বললেন, 'এখান থেকে ট্রেনে জ্যাকসন হাইট যাওয়া যায়। স্টেশনটা কোথায়?'

'আসুন। আমিও ওদিকে যাব।'

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বয়স্কা মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার দেশের ঠিকানা চাইলে দেবেন? আমার ভাই থাকে ফরিদপুরে। ও গিয়ে আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করে আলাপ করতে পারে।'

উত্তর দেওয়ার আগেই ট্রেন এসে গেল। ওরা ট্রেনে উঠল। এই ভোরে পুরো ট্রেন ফাঁকা। শাহিন ভদ্রলোককে বলল, 'আমি পরের স্টেশনে নেমে যাব।'

'কেন?'

'ওখান থেকে আমার স্টেশনে যাওয়ার সরাসরি ট্রেন পাব।'

স্টেশন এসে গেলে হাত নেড়ে নেমে গেল সে। ফিরেও একবার

তাকাল না। দিদির কথায় যে ইঙ্গিত ছিল সেটা বুঝে অস্বস্তি বেড়েছে তার। বোনকে বিপদে ফেলতে চায় না সে।

মালকিনের রেস্টুরেন্টে না গিয়ে গ্যারাজেই চলে এল শাহিন। গ্যারাজের লোক বলল জো আর দিয়াগো ট্রাকের ব্যাপারে কথা বলতে কালই উকিল নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছে। ওখানে যাওয়ার পর ওরা কেউ ফোন করেনি।

সাত সকালেই স্নান করে কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল সে। এই ঘর তাকে ছেড়ে দিতে হবে। ফিরে এসে জো তাকে দেখলে নিশ্চয়ই খুশি হবে না। কিন্তু এখন তার শরীর ঘুম চাইছে। ঘণ্টাখানেক হয়তো ঘুমিয়ে ছিল হঠাৎ ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ল শাহিন। সে স্বপ্ন দেখছিল? ওই মিষ্টি মেয়েটি হেসে তাকে বলল, 'কেন আছেন এখানে? দেশে ফিরে আসুন না!' শোনামাত্র তার ঘুম ভেঙে গেল।

মন খারাপ হয়ে গেল শাহিনের। স্বেচ্ছায় সে এই নির্বাসনে এসেছে। এখান থেকে বেরোবার সব পথ বন্ধ একথা মেয়েটিকে সে কী করে বোঝাবে। আজ যে পোর্ট অথরিটিতে সে স্বচ্ছন্দে বাস থেকে নেমেছে সেই একই জায়গায় বাফেলো থেকে এসে কী ভয়ংকর সংকটে পড়েছিল। কোনও লোককে সে তার কথা বোঝাতে পারেনি। সে যে ইংরেজি তখন বলত তা এদের বোধগম্য হয়নি। শেষ পর্যন্ত একজন পাকিস্তানি দোকানদার তাকে সাহায্য করায় রিতার দেওয়া নম্বরে ফোন করতে পেরেছিল। সাড়া পেয়ে বলেছিল, 'আমি শাহিন—!'

'শাহিন? রেফারেন্স, দিন।'

'আমি এখন পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনাসে, রিতা আপনাকে ফোন করতে বলেছেন।'

'তাই বলুন। নিউইয়র্ক শহরে দেড় হাজার শাহিন আছে। শুনুন, ট্রেন ধরে সোজা ব্রুকলিনে চলে আসুন। চার্চ গেট স্টেশনে নামবেন। ওপরে উঠে আমাকে আর একবার ফোন করবেন।' লাইন কেটে দিল লোকটা।

ভয় ছিল বেশি, সেইসঙ্গে অনভ্যাসের আড়ষ্টতা। এর সঙ্গে যোগ

হয়েছিল কথা বুঝতে এবং বোঝাতে না পারা। তবু ঠোক্কর খেতে খেতে যে স্টেশনে সে নামল তার নাম ম্যাকডোনাল্ড চার্চ গেট। শুধু চার্চ গেট বলে কোনও স্টেশন নেই, ট্রেনে টাঙানো ম্যাপ দেখে বুঝেছিল সে।

ওপরে উঠে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। চওড়া পরিষ্কার রাস্তা, দু'ধারে ছবির মতো দোকান। কিন্তু খুব অল্প মানুষ ফুটপাতে হাঁটছে। সে আবার একটা টেলিফোনের বাক্সের কাছে গিয়ে পয়সা ফেলে বোতাম টিপল।

'হ্যালো!'

'আমি শাহিন, মানে রিতা—!'

'বুঝেছি। ঠিক কোথায় আছেন?'

শাহিন চারপাশে তাকিয়ে ঠিক পিছনের দোকানের বোর্ডটার কথা বলল।

'আসছি।'

মিনিট পাঁচেক পরে বারমুডা আর ফতুয়া পরা একজন প্রৌঢ় এসে দাঁড়াল সামনে, 'শাহিন?'

'হ্যাঁ।'

'লোকে আমাকে আজাদভাই বলে।'

'সেলাম আলেকুম।'

'আলেকুম সেলাম। চলো।'

সুটকেস নিয়ে আজাদ ভাইয়ের সঙ্গে হাঁটতে থাকল সে। হাঁটতে হাঁটতে আজাদভাই জিজ্ঞাসা করল, 'কোন ডিস্ট্রিক্ট?'

'ফরিদপুর।'

'নিরীহ জায়গা, ম্যারেড?'

'না-না।'

'এই যে সোনার খাঁচায় ঢুকলে আর বেরুতে পারবে না তা কি জানা আছে?' আজাদ তাকাল।

'হ্যাঁ।'

'বাঃ। তা হলে তো কোনও সমস্যা নেই।

একটা বাড়ির পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকে আজাদ চেঁচাল, 'চাচা, ও চাচা! একটু বাইরে এসো।'

শাহিন অবাক হয়ে দেখল বাড়িটির নীচ থেকে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল এক বৃদ্ধ যার পরনে গেঞ্জি আর লুঙ্গি। ওপরে উঠেই খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি, 'না না, আমার এখানে জায়গা নেই। শালা যত্ত ঝামেলা তুমি আমার এখানে না আনলে খুশি হও না, না? অন্য কোথাও যাও।'

'চাচা, আপনি ছাড়া এদের কে আছে বলুন।'

'আমি নেই। তা ছাড়া আমার ওই ঘরে আটজন হয়ে গিয়েছে। পাশ ফেরার জায়গা নেই। নিশ্চয়ই চোরাই মাল এনেছ?'

'তা না হলে ও নিজেই ঘর ভাড়া করত। একটু নরম হন চাচা।'

'নরম? শেষ যে মালটাকে ঢোকালে সে আস্ত শয়তান। বরিশালের মাল বলে নিতে রাজি ছিলাম না। পনেরো দিন থেকে এক পয়সা না দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। না না আজাদভাই, অন্য কোথাও যাও।'

'চাচা, আপনি ওর সঙ্গে একটু কথা বলুন।'

'কী কথা বলব? অ্যাঁ?' তারপর শাহিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে আসতে কত খরচ পড়ল?'

'কোনও খরচ হয়নি।' শাহিন জবাব দিল।

'মিথ্যে কথা।'

'আমি মিথ্যে কথা বলি না।'

'তাই নাকি? কী নাম?'

'শাহিন।'

'বাংলাদেশের কোথায় বাড়ি?'

'ফরিদপুর।'

'অ। মাসে একশো ডলার দিতে পারবে?'

'আমার কাছে তো অত ডলার নেই।'

'আমি কি তোমাকে বলেছি এখনই দিতে। একমাস শেষ হওয়ামাত্র দিতে হবে। দিতে পারলে থাকো, নইলে কেটে পড়ো।'

শাহিন অসহায় চোখে আজাদের দিকে তাকাল। আজাদ বলল, 'চাচা, শাহিন আজই এখানে এসেছে।' কোনও অভিজ্ঞতা নেই। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন, হাজার হোক আপনার জেলার ছেলে।'

'কার জেলা? আমার কোনও জেলা নেই। যত্ত আজে বাজে ঝামেলা তুমি আমার ঘাড়ে চাপাও। ঠিক আছে, এই শেষবার। এসো।'

আজাদ হেসে শাহিনকে বলল, 'দরকার হলে ফোন কোরো। যাচ্ছি।'

সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতেই একটা প্যাসেজের দু'পাশে দুটো ঘর দেখতে পেল শাহিন। চাচা একপাশের ঘরের বন্ধ দরজা দেখিয়ে বলল, 'ওই ঘরে আটজন ঘুমায়। এদিকে এসো।'

উলটোদিকের দশ বাই দশ ঘরটাতে একটা সুন্দর বিছানা, টেবিল চেয়ার পাতা। চাচা বলল, 'ওইখানে আমি ঘুমাই। খাটের নীচে শতরঞ্চি আর গদি আছে। রোজ রাত্রে ওগুলো বের করে এই পাশে বিছানা করে নেবে। সকালে উঠে আবার চালান করে দেবে খাটের নীচে। চলো, বাথরুম, কিচেন দ্যাখাই।'

পেছনদিকের একটা দরজার তালা খুললেন চাচা, 'ডানদিকে কিচেন, বাঁ দিকে বাথরুম, কমোড। এইখানে আমি ওদের ঢুকতে দিই না। ওদের জন্যে ওপাশে ব্যবস্থা আছে। ওদিকে জায়গা খালি না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার ঘরে থাকবে, এগুলো ব্যবহার করবে। আমার শ্বশুরবাড়ি ছিল ফরিদপুরে, তাই তোমাকে অ্যালাউ করছি। বুঝেছ?'

মাথা নেড়েছিল শাহিন।

'সকালে কিছু খেয়েছ?'

'না।'

'কোথা থেকে আসছ?'

'কানাডা। বাফেলো থেকে বাসে উঠেছি।'

'পকেটে কত ডলার আছে?'

ডলারগুলো বের করে দেখাল শাহিন। চাচা হেসে ফেলল, 'ব্যস! হায় আল্লা, আমার কপালে কেন এরা জোটে! যাও, হাত মুখ ধুয়ে নাও।'

কুড়ি মিনিট পরে আবার ডাক পড়ল। কিচেনে ঢুকে শাহিন দেখল টেবিলে দুটো ভাতের থালা নিয়ে চাচা দাঁড়িয়ে আছেন, 'আমার এখানে ভাত ছাড়া আমি কিছু খাই না। চারবেলা ভাত। প্রথমদিন বলে মাগনা খাওয়াচ্ছি। খাও।'

নরম নরম ভাত আলুভর্তা আর শুঁটকিভর্তা একপাশে পেঁয়াজ আর লঙ্কা। দেশে থাকতে শুঁটকি খেত না সে। গন্ধ সহ্য করতে পারত না। কিন্তু এখন তার পেটে এত খিদে ছিল যে গোগ্রাসে খেয়ে ফেলল সবটা।

খাওয়ার ধরনটা চাচা লক্ষ করছিলেন। শেষ হলে বললেন, 'এবার চাকরির খোঁজে বেরিয়ে পড়ো। আজ রাত্রের ভাত এখানে খাবে কিন্তু কাল থেকে তোমাকে নিজের ব্যবস্থা করতে হবে।'

ঢোঁক গিলল শাহিন, 'এখানে চাকরি কোথায় পাওয়া যাবে!'

কয়েক সেকেন্ড শাহিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চাচা বললেন, 'সে কী! দেশে শোনোনি, আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায় চাকরির গাছ আছে! হাত বাড়ালেই পেড়ে নেওয়া যায়। যাও, পেড়ে নাও। যত্ত উটকো ঝামেলা আমার ঘাড়ে আসে। ব্রুকলিনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বাংলাদেশিদের দোকান খুঁজে বের করো। ভেতরে ঢুকে মালিককে বলবে তোমার কাজ চাই। দশ জায়গায় গেলে এক জায়গায় পেয়ে যাবে।'

সারাদিন ম্যাকডোনাল্ড চার্চ গেটের সব বাংলাদেশি দোকান দেখা হয়ে গেল শাহিনের। না, কোথাও কাজ খালি নেই। সন্ধেবেলায় এক গ্রসারি শপের মালিক জিজ্ঞাসা করল, 'পাসপোর্ট-ভিসা নাই তো?'

'না।'

'মালের বস্তা নামাতে হবে ট্রাক থেকে। জিনিসগুলো ঠিক জায়গায় সাজাতে হবে। দোকান পরিষ্কার করতে হবে সকাল-বিকাল। কাস্টমারকে মাল ওজন করে দিতে হবে। বারো ঘণ্টার কাজ। দিনে আঠারো ডলার। রাজি থাকো তো কাল সকাল দশটায় আসবা।' পাকা দাড়িতে আঙুল বুলিয়ে মালিক বলেছিল।

আঠারো ডলার দিনে, মানে মাসে পাঁচশো চল্লিশ। ~~বাবাকে~~ চাচাকে একশো দিয়ে দিলে থাকবে চারশো চল্লিশ। নিজের খাওয়া-হাত খরচের জন্যে একশো ডলার রাখলে সে তিনশোও চল্লিশ ডলার দেশে পাঠাতে পারবে। দেশে সেটা তেইশ হাজার টাকার ওপর হয়ে পৌঁছোবে। আনন্দে দ্রুত হাঁটতে লাগল সে।

বাসায় ফেরার পর চাচাকে সব বলতে তিনি মুখ বিকৃত করলেন, 'শালা!'

'মানে?' ঘাবড়ে গেল শাহিন।

'বৈধ কাগজপত্র থাকলে ঘণ্টায় আট ডলার সরকারি আইন অনুযায়ী দিতে হয়। কাগজ না থাকায় এরা সুযোগ নেয় কিন্তু ঘণ্টায় অন্তত আড়াই ডলার দেয়। বারো ঘণ্টার জন্যে তিরিশ ডলারের বদলে শালা আঠারো ডলার দেবে। লাথি মারো।'

'তা হলে আমি কাল যাব না?'

'আমি হলে যেতাম না।'

'কিন্তু কাল থেকে আমি খাব কী?'

'তোমার পকেটে তো কিছু ডলার আছে। কিছু ডাল আলু কিনে এনে ফুটিয়ে খাও। গ্যাসের জন্যে না হয় চার্জ করব না।'

সাতদিনের মাথায় প্রথম চাকরি পেয়েছিল শাহিন। একটা বাংলা বই-এর দোকানে সেলসম্যানের চাকরি। ছোট দোকান কিন্তু প্রচুর গল্পের বই, ধর্মের বই। দোকানের মালিকের বয়স হয়েছে। চাচাই ঠিক করে দিয়েছিলেন। সকাল এগারোটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত কাজ। দিনে দেড়শো ডলার বিক্রি হলে শাহিন পাবে বাইশ ডলার। তার নীচে বিক্রি হলে পনেরো ডলার। সেই সঙ্গে লাভ, বই পড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে।

ভাত ডাল আর আলুভর্তায় পেট ভরতি করে শাহিন দোকানে যেত। বেশির ভাগ খদ্দের এসে ধর্মগ্রন্থ চাইত। তবে অল্পবয়সি মেয়েরা এসে হুমায়ূন আহমেদের বই চাইত। বাংলাদেশের একশো টাকার বইটার দাম নিউইয়র্কে দশ ডলার। প্রথম দিনেই তিনশো দশ ডলার বিক্রি হল। বৃদ্ধ মালিক খুব খুশি, 'তুমি দেখছি বেশ লাকি ছেলে। কাল থেকে টিফিনটা আমি তোমাকে খাওয়াব।'

চাচাই দেখিয়ে দিয়েছিল কোথায় কার কাছে গেলে হুন্ডির মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। চাচা বলেছিলেন, 'এ অত্যন্ত বিশ্বস্ত মানুষ। দু'নম্বরি করে না।' কিন্তু হুন্ডির কমিশন একটু বেশি। একশো ডলার দেশে পৌঁছে দিতে পাঁচ ডলার নেবে।

লোকটি বলল, 'খবর নিয়ে দেখবেন, এক্কেবারে নতুন বাংলাদেশি নোট আপনার বাসায় পৌঁছে যাবে। আজ এখানে টাকা দিন, কাল বাসায় টাকা যাবে।'

কয়েক মাসে বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল শাহিন। একটু একটু করে এ দেশীয় ইংরেজি বলতে শিখেছিল। অসুবিধে তেমন হচ্ছিল না। শুধু মাঝে মাঝে যখন পুলিশের গাড়ি দেখত তখন বেদম ভয় পেয়ে যেত। বুকের ভেতর ড্রাম বাজত।

এক দুপুরে গাড়ি থেকে নেমে এলেন যিনি তাঁকে দেখে বাঙালি বলে মনে না হওয়া শাহিন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ইয়েস?'

'ইংরেজিতে কোরান আছে?'

'আছে। বাংলাতেও আছে!'

'আমি কি বাংলায় আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছি? বাসায় কেউ বাংলা পড়তে জানে না। এক কপি দিন।'

বইটি ভাল করে প্যাক করে দাম নিয়ে রসিদ কেটে দিয়ে শাহিন বলল, 'স্যার, আপনি নিশ্চয়ই বাংলা পড়তে পারেন।'

'হুঁ।'

'তা হলে এই বইগুলো একবার দ্যাখেন। হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস... প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, জাফর ইকবালের উপন্যাস, ইমদাদুল হক মিলনের...!'

'আমি বই পড়ার সময় পাই না।'

পার্স বের করে ডলার দিলেন ভদ্রলোক।

'একটু যদি সময় বের করেন। ভাষা তো মায়ের মতো।'

'অদ্ভুত ছেলে তো তুমি।'

বই নিয়ে ফেরত যেতে যেতেও থমকে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। তারপর পার্স থেকে একটা কার্ড বের করে ফিরে এসে শাহিনের সামনে রেখে বললেন, 'যদি প্রয়োজন হয় আমাকে ফোন করতে পারো।'

সেই রাত্রে চাচাকে বলেছিল ভদ্রলোকের কথা। আজকাল মাঝে মাঝেই একশো ডলারের নীচে বিক্রি হচ্ছে। তাতে রোজগারও কমে যাচ্ছে। চাচা বললেন, 'আল্লা কখন কার জন্যে কী ব্যবস্থা করে রেখেছেন

তা একমাত্র তিনিই জানেন। কাল সকালে এই লোকটিকে ফোন করে বলবে দেখা করতে চাও। যদি যেতে বলে তা হলে ওঁকে বলবে তোমার চাকরি চাই। দ্যাখো কী হয়!'

পরের দিন বইয়ের দোকানে ফোন করে সে জানিয়ে দিল তার যেতে দেরি হবে। শোনামাত্র বৃদ্ধ মালিক চেঁচামেচি শুরু করলেন। কিছু না বলে ফোন রেখে দিল সে।

বেলা বারোটা নাগাদ ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে সে যেখানে হাজির হল সেটা একটা বড় সড় রেস্টুরেন্ট। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখল তখনও রেস্টুরেন্ট ফাঁকা। ইউনিফর্ম পরা কিছু লোক কাজকর্ম করছে। কাউন্টারের ওপাশ থেকে গলা ভেসে এল, 'ইয়েস!'

তাকিয়েই চিনতে পারল সে। এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে বলল, 'আমি শাহিন। এই কার্ডটা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন।'

'আমি তোমাকে ফোন করতে বলেছিলাম।'

'তিনবার চেষ্টা করেছি। ফোন ব্যস্ত ছিল বোধহয়।'

'চারবার চেষ্টা করোনি কেন?'

'ভুল হয়ে গেছে।'

'কী চাই?'

'আমার একটা চাকরির খুব দরকার। যেখানে করছি সেখানে মাইনে খুব কম।'

'পেপার নেই নিশ্চয়ই?'

'না।'

'ইংরেজি বলতে পারো না মায়ের ভাষা ছাড়া কিছু জানো না?'

'অল্প অল্প পারি।'

'এখানে যার সঙ্গে থাকো তাকে নিয়ে কাল এগারোটায় দেখা কোরো।'

চাকরিটা হয়ে গিয়েছিল তার।

শান! শান! শান! গভীর ঘুম ভাঙতে সময় লাগল। কেউ তাকে ডাকছে। চোখ খুলে গ্যারাজের ছেলেটিকে দেখতে পেল সে। ছেলেটি উত্তেজিত

হয়ে বলল, 'জো তোমাকে এখনই গ্যারাজ থেকে চলে যেতে বলল।'

'জো কোথায়?'

'এখনও ফেরেনি। বলল, পুলিশ তোমাকে খুঁজতে আসবে এখনই। তুমি এখানে থাকলে অ্যারেস্ট করবে। ওই ড্রাইভার বলেছে তোমার কথা।'

লাফ দিয়ে নীচে নামল শাহিন। জো-দের কাছে তার বেশ কিছু ডলার পাওনা আছে। সেগুলো না হয় পরে নেওয়া যাবে। কিন্তু এখন কোথায় যাওয়া যায়?

সুটকেস নিয়ে দ্রুত রাস্তায় চলে এল ও। আশেপাশে কোনও পুলিশের গাড়ি চোখে পড়ছে না। সে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়ল। ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞাসা করামাত্র মালকিনের রেস্টুরেন্টের ঠিকানাটা বলে ফেলল।

রেস্টুরেন্টের সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই মালকিনের দেখা পেল সে। মালকিনের মুখ গম্ভীর, 'এখানে এলে কেন?'

'জো বলেছিল—!'

'না। দিয়াগো ফোন করেছিল। পুলিশ তোমাকে খুঁজছে। ওরা নিশ্চয়ই জেনে যাবে তুমি এখানে কাজ করতে।'

'তা হলে আমি কোথায় যাব?'

'আমি কী করে বলব?'

'দ্যাখো, আমি কোনও অন্যায় করিনি। দিয়াগোর উচিত আমার পাশে দাঁড়ানো। এতদিন ওখানে কাজ করেছি কিন্তু অসৎ হইনি। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

একটু ভেবে টেলিফোনটা দেখিয়ে দিলেন মালকিন। শাহিনের খেয়াল হল, সেলফোন দুটো আর ফাইল গ্যারাজের ঘরে ফেলে এসেছে। সে ফোনের বোতাম টিপল। দিয়াগোর গলা কানে আসতেই বলল, 'আমি তো কোনও অন্যায় করিনি তা হলে পুলিশ আমাকে খুঁজছে কেন?'

'ওই ড্রাইভার তোমাকে ফাঁসিয়েছে। ফাইলগুলো কোথায়?'

'গ্যারাজের ঘরে।'

'শোনো, আমি দিদিকে বলে দিচ্ছি তোমাকে তিনশো ডলার দিতে।

আপাতত কিছুদিনের জন্যে গা ঢাকা দাও। পারলে নিউইয়র্কের বাইরে চলে যাও। দরকার হলে দিদির ফোনে জানিয়ো, ডলার পাঠিয়ে দেব। সব ঠান্ডা হলে আমি জানালে ফিরে এসো।' দিয়াগো বলল।

'আমাকে কেন পুলিশ খুঁজছে?'

'ড্রাইভারের ড্রাগের বিজনেসে তুমি সাহায্য করেছ বলে ওরা মনে করছে। এ দেশে এটা মারাত্মক অপরাধ।' দিয়াগো বলল, 'লাইনটা ওকে দাও।'

রিসিভার মালকিনের দিকে এগিয়ে দিলে শাহিন। হঠাৎ তার হাত পা থেকে যেন সব সাড় চলে গেল।

ভায়ের সঙ্গে কথা শেষ করে শাহিনকে তিনশো ডলার বের করে দিল মালকিন। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মহিলার বোধহয় মনে মায়া এল। বললেন, 'এই তিনশো ডলারে কতদিন চলবে তোমার? পকেটে কিছু আছে?'

'আছে।'

'তবু..., দাঁড়াও।' রিসিভার তুলে নম্বর টিপে নিচু গলায় কিছুক্ষণ কথা বলে হাসলেন তিনি। রিসিভার রেখে দিয়ে বললেন, 'একটা জায়গায় গেলে তুমি নিরাপদে থাকতে পারবে। ঘণ্টা পাঁচেক কোথাও কাটিয়ে সোজা ক্যাথির বাড়িতে চলে যাও। ও তোমাকে থাকতে দিতে রাজি হয়েছে। মাসখানেক থাকো। খাওয়া এবং ঘুমের সমস্যা হবে না। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ো না। এর মধ্যে এদিকটা ঠান্ডা হয়ে যাবে বলে আশা করছি। আর ক্যাথির সঙ্গে যদি সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় তা হলে তো কথাই নেই।'

সন্ধে সাতটা নাগাদ দরজার বাধাগুলো ক্যাথির সৌজন্যে পার হয়ে ওর ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারল শাহিন। তাকে দেখে ক্যাথি বলল, 'ও, একেবারে সুটকেস নিয়ে হাজির হয়েছ! ওকে। শোনো, আমি যাকে একবার রিজেক্ট করি তাকে আর অ্যাকসেপ্ট করি না। কিন্তু কখনও কখনও নির্বোধদের জন্যে সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়। তোমাকে যে ঘরে থাকতে বলেছিলাম ওটা সেখানে রেখে এসো।'

সুটকেস পাশের ঘরে রেখে এলে ক্যাথি বলল, 'এসো, তোমাকে কিচেন দেখিয়ে দিই। আজ ডিনার রাঁধতে হবে না। আমি ফাস্টফুড জয়েন্ট থেকে নিয়ে এসেছি। কাল সকাল ছ'টায় উঠে বেড-টি বানিয়ে আমাকে ডাকবে। সাড়ে সাতটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট রেডি চাই। আমি খুব হাল্কা ব্রেকফাস্ট করি। কনফ্লেক্স উইদ মিল্ক, ফল, কলা এবং আপেল, একটা হাফ বয়েল ডিম। কফি বা চা চাই না। আমি বেরিয়ে যাব পৌনে আটটায়। তারপর তুমি ফ্ল্যাট ক্লিন করবে। বিছানা তৈরি করবে। আমি ময়লা সহ্য করতে পারি না। বাসি জামাকাপড় ওয়াশিংমেশিনে দেবে। দুপুরে সেগুলো ভাঁজ করে রাখবে বেডরুমে। লাঞ্চে কী খাবে তা ঠিক করে বানিয়ে নেবে। এ সপ্তাহের পুরো বাজার ফ্রিজে আছে। বিকেলে ডিনার বানাবে। কী মেনু হবে আমি ফোনে বলে দেব। ওকে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল শাহিন। মনে মনে ঠিক করল এ ব্যাপারে কিচেনআন্টির সাহায্য নিতে হবে।

'ফাইনালি, আমার সামনে নোংরা পোশাক পরে আসবে না। আমাকে বলা হয়েছে প্রথম মাসে তোমাকে কোনও পেমেন্ট করতে হবে না। ওকে?'

আবার মাথা নাড়ল শাহিন।

'আমি এখন ডিনার করব। তুমি কি আমার সঙ্গে খাবে?'

'আপনার আপত্তি না থাকলে—!'

'চলে এসো।'

ডিনারের দুটো চিকেন স্টেকের প্যাকেট ছিল। পরিমাণে অনেকটা, তাই পেট ভরে গেল। ক্যাথি বলল, 'তুমি শব্দ করে খাওনি বলে আমি খুশি হয়েছি।'

খাওয়া শেষ করে উঠে গেল ক্যাথি। শাহিন তাকাল। এখন তাকে টেবিল পরিষ্কার করতে হবে, ডিশ গ্লাস ধুতে হবে। অর্থাৎ ক্যাথির বাড়িতে চাকরের চাকরি করতে হবে বিনা মাইনেতে। তার ইচ্ছে করছিল এখনই এই ফ্ল্যাট থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু কোথায় যাবে? পুলিশ যদি তাকে ড্রাগ পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করে তা হলে আর দেখতে হবে না। দিয়াগো বলেছে এক মাসের মধ্যে

সব ঠিক হয়ে যাবে। এই এক মাস পুলিশকে এড়িয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি আর একটা সমস্যা আছে। দেশে টাকা পাঠাতে হবে। জো-দিয়াগোর কাছে তার টাকা পাওনা আছে। সেই টাকা নিয়ে হুন্ডি করতে যেতে হবে। পুলিশের ভয়ে সেটা করতে না পারলে আব্বু আম্মু নিশ্চয়ই খুব চিন্তায় পড়ে যাবে। হঠাৎ তার মনে হল মালকিনকে যদি ফোনে বলে, দেশে ডলার পাঠানোর জন্যে দিয়াগোকে অনুরোধ করতে তা হলে তো সমস্যা থাকে না। দেশের ঠিকানা এবং যে লোকটা হুন্ডি করে তার ঠিকানা দিয়াগোকে দিয়ে দিলেই সে অনায়াসে কাজটা করে দিতে পারবে।

ডিশ গ্লাস ধুয়ে ঠিক জায়গায় রেখে আলো নিভিয়ে নিজের শোওয়ার জায়গায় চলে এল শাহিন। ক্যাথি তাকে আগেরবার বলেছিল, ওর শোওয়ার ঘরে না ঢুকতে। আবার ঢোকেনি বলে সে নাকি বিরক্ত হয়েছিল। ক্যাথি যদি আবার বিরক্ত হয়ে তাকে চলে যেতে বলে তা হলে মহাবিপদ। সে ইতস্তত করে ক্যাথির ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা ভেজানো। শাহিন মৃদু টোকা দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথির গলা পাওয়া গেল, 'হু ইজ দেয়ার?'

'শাহিন।'

'তোমার নাম শান। তাই না?'

'হ্যাঁ। শান।'

'দরজাটা একটু ঠেলো।'

দরজায় চাপ দিতে সেটা অল্প খুলল। ক্যাথি শুয়ে আছে তার বিছানায়। গায়ে পাতলা চাদর জড়ানো। মাথার পাশে টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে।

'কিছু বলবে?'

'আমি কি এবার ঘুমাতে যেতে পারি!'

শব্দ করে হাসল ক্যাথি, 'এটা জিজ্ঞাসা করার কি দরকার আছে?'

'শুনেছিলাম আপনি আগেরবার খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।'

'ওয়েল, এই কয় বছরে দেখছি তুমি বেশ স্মার্ট হয়ে গেছ। কিন্তু শান, আজ সকাল থেকে আমি সিক। তাই গুড নাইট।'

দরজা ভেজিয়ে পাশের ঘরে চলে এল শাহিন। আনন্দে তার নাচতে

ইচ্ছে করছিল। এই প্রৌঢ়ার শরীর খারাপ সারা মাস ধরে থাক।

সকালে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল পাঁচটার সময়। এখানে রোদ ওঠে অনেক দেরিতে। তবু বিছানা ছাড়ল শাহিন। মাইক্রো ওভেনে জল গরম করে টি ব্যাগ ডুবিয়ে চা তৈরি করে ক্যাথির দরজায় শব্দ করল। তৃতীয়বারেও কোনও আওয়াজ না পেয়ে চায়ের কাপ নিয়ে ভেতরে ঢুকল। ঘর অন্ধকার। দরজাটা পুরো খুলে দিতে ক্যাথিকে আবছা দেখতে পেল। পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। চাদর সরে গেছে, ঘুম-পোশাক উঠে গেছে প্রায় কোমরের কাছে। মহিলা প্রৌঢ়া, মুখে বয়সের ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু শরীর এখনও নিটোল, চকচকে। চোখ সরাতে পারছিল না শাহিন। পায়ের আঙুল থেকে হাঁটু হয়ে তার দৃষ্টি ঘুম-পোশাকের প্রান্তে গিয়ে থমকে যাচ্ছিল।

'চায়ের কাপ রেখে দিয়ে যাও।' একটুও না নড়ে বলল ক্যাথি।

হকচকিয়ে বিছানার পাশের টেবিলে কাপটাকে নামিয়ে বেরিয়ে এল শাহিন। তার মানে, ক্যাথি ঘুমের ভান করে শুয়ে আছে? কী কাণ্ড!

ব্রেকফাস্ট করে ক্যাথি জিজ্ঞাসা করল, 'ফ্রিজ খুলে দেখেছ কিছু আনতে হবে কিনা?'

'দেখেছি। চিকেন কম আছে।'

'ঠিক আছে, নিয়ে আসব।'

'আপনার শরীর খারাপ, আমি নিয়ে আসতে পারি!'

ক্যাথি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর চুপচাপ উঠে গেল।

শূন্য ফ্ল্যাটে সময় কাটছিল না শাহিনের। খিদে পেয়েছিল বলে রুটি-মাখন খেয়ে নিয়েছিল। দুপুরে অনেক ভেবেচিন্তে মালকিনকে ফোন করল সে।

'শাহিন বলছি।'

'আবার কী হল?'

'আমাকে এখানে চাকরের মতো থাকতে হচ্ছে!'

'নিজেকে চাকর না ভাবলেই তো হল। তোমার নিরাপদে থাকার জন্যে ওখানে থাকাটা জরুরি। তাই না?'

'কিন্তু!'

'আর কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। দিয়াগোদের কাছে আমি ডলার পাই। আমার রোজগারের ডলার। আমার দেশে ওটা পাঠাতে হবে। ও পারবে কিনা জিজ্ঞাসা করে রাখবেন?'

'বেশ।' লাইন কেটে দিলেন মালকিন।

বিকেলে ক্যাথি এলে শাহিন বলল, 'আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।'

'কেন?'

'একটু দরকার আছে।'

'বেশ। ডিনার করে রেখেছ?'

'না।'

'সেকী?'

'আমি বাইরে থেকে নিয়ে আসব।'

শাহিন বেরিয়ে এল। অন্যমনস্কভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল সে। ফাঁকা রাস্তা। হঠাৎ দুটো কালো ছেলে সামনে এসে দাঁড়াল। কিছু বোঝার আগেই ওরা হাত চালাল। মাটিতে পড়ে গেল সে। ছেলে দুটো তার পকেট হাতড়ে যা পেল তা নিয়ে দৌড়ে উধাও হয়ে গেল। যন্ত্রণায় ছটফট করছিল শাহিন ফুটপাতে শুয়ে। এই সময় একটা পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল ফুটপাত ঘেঁষে। অফিসার নেমে এসে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওদের তুমি চেনো?'

মাথা নেড়ে না বলল।

'তোমার রক্ত পড়ছে ওঠো।' হাত ধরে তাকে টেনে তুলে অফিসার বলল, 'চলো, তোমাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিই।'

শরীরের যন্ত্রণার চেয়ে অকস্মাৎ ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় চেপে ধরল শাহিনকে। গাড়িতে বসিয়ে অফিসার একগাদা পেপার ন্যাপকিন এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাকের নীচে চেপে ধরো। রক্ত পড়া বন্ধ হবে।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছে অফিসার বলল, 'ভেতরে গিয়ে ডাক্তারকে দেখিয়ে পাশের থানায় চলে এসো। কমপ্লেন লেখাবে। আমি ওখানে থাকব।'

হাসপাতালে ঢুকতে ঢুকতে শাহিন লক্ষ করল অফিসার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। নাক দিয়ে আর রক্ত বের হচ্ছিল না। ভেতরে না ঢুকে রাস্তায় বেরিয়ে সে মরিয়া হয়ে ট্যাক্সি থামাল, চিকিৎসা করিয়ে ওই অফিসারের কাছে গেলে লোকটা সত্যি কথা ঠিক বার করে নেবে। পকেটে ডলার নেই। না, আছে। কোমরের কাছে লুকোনো পকেটে সে সবসময় পঞ্চাশ ডলার রেখে দেয়। ছেলে দুটো তার হদিশ পায়নি। সে শরীর ট্যাক্সির সিটে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'সোজা চলো।'

পনেরো মিনিট বাদে চোখ মেলে মনে হল রাস্তাটা তার অচেনা নয়। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর সে সোজা হল। তিরিশ ডলার ভাড়া দিয়ে কিছুটা হেঁটে রেস্টুরেন্টের সামনে পৌঁছে গেল। পাশেই সেই গ্রসারির দোকান।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দেখল রেস্টুরেন্ট জমজমাট। কাউন্টারের ওপাশে মালিক কাজে ব্যস্ত। তাকে দেখে কাউসার দৌড়ে এল, 'আরে! শাহিনভাই!'

মালিক চোখ তুলে তাদের দেখে বললেন, 'কাউসার! তুমি ডিউটিতে আছ। শাহিন, কোথায় ছিলে এতদিন? ওই রেস্টুরেন্ট বলতে পারল না তোমার ঠিকানা। তোমাকে আমি খুব খুঁজছি।'

'কেন?'

'তোমার নাকে কী হয়েছে?'

'ও কিছু না।'

'ওয়েল, তোমার জন্য একটা ভাল খবর আছে।' বলে কাউন্টারের নীচ থেকে একটা কাগজ বের করে সামনে ধরল মালিক, 'লটারিতে তোমার নাম উঠেছে।'

'কী?' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না শাহিন।

সে তাকিয়ে দেখল রেস্টুরেন্টের সব কর্মচারী এখন কাজ ছেড়ে তার পাশে হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। মালিক বলল, 'প্রত্যেক টার্মে আমি তোমার আবেদন রিনিউ করে গিয়েছি। দিস টাইম ইউ আর লাকি! খুব কম মানুষই লটারির মাধ্যমে আমেরিকার নাগরিকত্ব পেয়ে থাকে। বসো। কথা আছে।'

মাথা ঘুরছিল শাহিনের। পা টলছিল। কাউসার তাকে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে চিৎকার করল, 'এক গ্লাস পানি আনো কেউ, জলদি।'

শাহিন সেই অবস্থায় হাসল। নিজের অজান্তেই হাসি ফুটল ঠোঁটে।

এই দিনটির কথা কখনও ভুলবে না শাহিন। পরিচয়হীন একটি মানুষকে ভাগ্য আচমকা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা-র নাগরিক হওয়ার পথে এগিয়ে দিল। এখন তাকে সামনে পা ফেলতে হবে, নিজের সততা প্রমাণ করতে হবে তার বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ করার অভিযোগ যদি না থাকে তা হলে সে নাগরিকত্ব পেতে পারে।

হঠাৎ মালিক চিৎকার করলেন, 'যাঁরা ইতিমধ্যে টেবিলে চলে এসেছেন তাঁদের সার্ভ করার পর আর নতুন কাস্টমার আজ রাত্রে রেস্টুরেন্টে নেওয়া হবে না। রেস্টুরেন্ট উইল বি ক্লোজড ফর সাম টেকনিক্যাল রিজন।'

সবাই অবাক। এ কী কথা! মালিকের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? রাত দশটায় বাইরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এখন সব কর্মচারীরা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। মালিক সিডি পালটালেন, 'ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা...' চিৎকার করলেন, 'এই গান আমরা সবাই শাহিনের জন্য গাইব। গাও সবাই।'

প্রথম লাইন চারটি গাওয়ার পর রনি আবিষ্কার করল এই গানের সুরের মধ্যে যে দুলুনি আছে তাতে শরীর নাচানো যায়। সে চট করে দুটো হাত দু'দিকে ছড়িয়ে নাচের ভঙ্গি করতে সেটা সংক্রমিত হল। 'ভায়ের মায়ের এত স্নেহ' যখন গাওয়া হচ্ছে তখন রনি ছুটে গিয়ে শাহিনকে টেনে আনল মাঝখানে এবং তাকে ধরে এমন ভঙ্গিতে নাচতে লাগল যেন বলড্যান্স করছে। মালিক হাততালি দিলেন, 'আরে! বাংলা গানে এত ভাল নাচ হয় আগে জানতাম না। আজ শাহিনের অনারে আমি তোমাদের সবাইকে ডিনার খাওয়াচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে হাততালিতে পায়রা উড়ল। গান শেষ হলে কাউসার শাহিনকে বলেছিল 'এত বড় খবরটা মালিক এতদিন কাউকে বলেনি!'

খাওয়াদাওয়ার আয়োজন যখন চলছে তখন মালিক তাকে জিজ্ঞাসা

করল, সে এখন কী করছে, কোথায় আছে? শাহিন সত্যি কথা বলতে গিয়ে সামলে নিল। বলল এতদিন সে ঘুরে ঘুরে নানারকম কাজ করেছে। কালই নিউইয়র্ক ফিরে এসেছে।

'তোমার সুটকেস কোথায়?'

মনে পড়ল শাহিনের। বলল, 'আগে যে রেস্টুরেন্টে কাজ করতাম সেখানেই।'

'ওটা নিয়ে কাল সকালে চলে এসো এখানে। তোমাকে নিয়ে কাল স্টেট অফিসে যাব। ওকে!'

খাওয়াদাওয়া করে মালিকের কাছ থেকে পঞ্চাশ ডলার ধার নিয়ে ট্যাক্সি ধরে শাহিন যখন ক্যাথির বাড়িতে ফিরে এল তখন রাত প্রায় বারোটা। বেল বাজিয়েও সাড়া পাচ্ছিল না সে। ক্যাথি যদি রিমোটে দরজাগুলো না খুলে দেয় তা হলে ওর ফ্ল্যাটে ঢোকা অসম্ভব। শেষবার একটু বেশি সময় বোতাম চেপে ধরেছিল তাই ক্যাথির ঘুমভাঙা গলা শুনতে পেল, 'হু ইজ দেয়ার?'

'শাহিন!'

'তুমি কী মনে করেছ? এটা হোটেল? যখন ইচ্ছে আসা যায়? আমি পুলিশের কাছে রিপোর্ট করলে কী হবে তা জানো না!'

'জানতাম। কিন্তু ক্যাথি, তুমি নিশ্চয়ই খুশি হবে, ইউএসএ গভর্নমেন্ট আমাকে এ দেশের সিটিজেন করে নিচ্ছে!'

'হোয়াট!' চেঁচিয়ে উঠল ক্যাথি, 'ইউ আর এ লায়ার।'

'সরি। আমি মিথ্যে বলছি না।'

শব্দ বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু দরজাটা খুলল না। কয়েক মিনিট পরে লিফটের শব্দ হল। দরজা খুলল ক্যাথি নিজে। তারপর সুটকেসটাকে বাইরে ঠেলে দিয়ে বলল, 'গেট আউট। ডোন্ট ডিস্টার্ব মি।' বলে দরজা বন্ধ করে দিল।

দিনদুপুরে যে পথ প্রায় জনশূন্য থাকে, মধ্যরাতে তাকে অন্য গ্রহের রাস্তা বলে মনে হয়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শাহিন ভেবে পাচ্ছিল না এখন কোথায় যাওয়া যায়। মালকিনের রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওখানে নিশ্চয়ই তালা ঝুলছে। কাউসারদের ওখানে গিয়ে ডাকাডাকি

করলে হয়তো শুনতে পারে। কিন্তু না। তার পকেটে এখনও ধার করা ডলার আছে।

ট্যাক্সি নিয়ে সে সোজা চলে এল পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনালে। সকাল পাঁচটা কি ছ'টায় যে সব বাস ছাড়বে তার যাত্রীদের অনেকেই চলে এসেছে। ভোরে এসে বাস ধরার ঝুঁকি নেয়নি তারা। এটাই রেওয়াজ। তাদের জন্য ইজিচেয়ার সাজানো অপেক্ষাগৃহ রয়েছে পরপর কয়েকটা। তার একটা খালি পেয়ে শরীর এলিয়ে দিল শাহিন। আঃ, কী আরাম!

নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য যে ফর্ম ভরতি করতে হল তাতে পরিষ্কার প্রশ্ন আছে, 'তোমার বিরুদ্ধে কোনও ক্রিমিন্যাল প্রসিডিং নেওয়া হয়েছিল অথবা পেন্ডিং আছে কিনা?' পাশের শূন্য জায়গায় 'নো' লিখল শাহিন। কোনও অপরাধ সে করেনি। কেউ তাকে অপরাধী বানাতে চাইছে কিনা তা তার জানা নেই। জো-দিয়াগোর গ্যারাজে সবাই তাকে শান বলে জানে। তার আসল নাম যে শাহিন তা দিয়াগো পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে। শুধু দিয়াগোর কাছে তার ছবি আছে। সেটা সে পুলিশকে দিয়েছে কিনা তা জানা যাচ্ছে না। ফর্মে আর একটি প্রশ্ন, গত পাঁচ বছরে সে কী কী ঠিকানায় থেকেছে? তা হলে তো মালিকের রেস্টুরেন্টের পরে মালকিনের রেস্টুরেন্টের ঠিকানা দিতে হয়। তার পরের বছরগুলো তো সে গ্যারেজে ছিল। তাকে ইতস্তত করতে দেখে মালিক বলল, 'আমাদের ঠিকানাটাই লিখে দাও। এখন তো কোনও ভয় নেই।'

শাহিনকে টেম্পোরারি ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হল। তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগের সন্ধান না পাওয়া গেলে গ্রিনকার্ড ইস্যু করা হবে। তার জন্যে ষাট দিন সময় লাগবে। এই ষাট দিন ওই পারমিটের দৌলতে সে স্বচ্ছন্দে চাকরি করতে পারবে।

বাইরে বেরিয়ে এসে মালিক জিজ্ঞাসা করল, 'এখন তুমি কী করবে?'

'মানে?'

'আমি তো তোমাকে আর কাজ দিতে পারব না।'

'কেন?'

'এখন তুমি ন্যায্য মজুরি চাইলে আমি দিতে বাধ্য হব। সেটা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া তোমাকে এখন থাকার জন্য ঘর ভাড়া করতে হবে। তোমার তো আর লুকিয়ে থাকার দরকার নেই!'

'সর্বনাশ! আমি এখন কী করব!'

'সর্বনাশ বলছ কেন? তুমি তো এটাই চেয়েছিলে।'

মালিক বললেন, 'এক কাজ করো। ম্যানহাটনে চলে যাও। ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটে 'হ্যাটস' নামে একটা টুপির দোকান আছে। ওর মালিক কোরিয়ান। ওকে আমার কথা বলো।' ঠিকানাটা বলে দিলেন মালিক।

ম্যানহাটনের সঙ্গে কুইন্স বা ব্রুকলিনের কোনও মিল নেই। নিউইয়র্কের সমস্ত এলাকা থেকে লোক ওখানে যায় কাজ করতে বা শপিং-এ। সারাদিন হইচই, সন্ধ্যের পর জনশূন্য। 'হ্যাটস' খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না। মালিক বলেছিলেন ওই দোকানের মালিকের নাম লি। দোকানে ঢুকে অবাক হল শাহিন। এত বড় টুপির দোকান হয়? ছেলে এবং মেয়েরা সেলসের কাজ করছে ইউনিফর্ম পরে।

মিস্টার লি বসেন ভিতর ঘরে। তাঁর পাশের টিভিতে দোকানের সবটাই দেখা যাচ্ছে। একগাল হেসে বললেন, 'ইয়েস!'

মালিকের কথা বলল শাহিন। ঘনঘন মাথা নেড়ে মিস্টার লি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওঃ, গুড ম্যান। কেমন আছেন উনি?'

'ভাল। আপনার এখানে কি আমি কাজ পেতে পারি?'

'ইউ আর ফ্রম বাংলাদেশ?'

'হ্যাঁ।'

'নো। আমি কোনও আনঅথরাইজড মানুষকে চাকরি দিই না। নিশ্চয়ই তোমার কাছে এ দেশে চাকরি করার অনুমতিপত্র নেই?'

'আছে।' পকেট থেকে ওয়ার্কিং পারমিটের কাগজ বের করে দেখাল সে।

সেটা পড়ে হাসলেন মিস্টার লি।

চাকরিটা হয়ে গিয়েছিল। দিনে ছয় ঘণ্টা ডিউটি। দিনে দুটো ব্যাচের

ছেলেমেয়েরা কাজ করে। দশটা থেকে চারটে, চারটে থেকে দশটা। ঘণ্টা পিছু সাড়ে সাত ডলার, দিনে পঁয়তাল্লিশ। মাসে সাড়ে এগারোশো ডলারের ওপর।

থাকার জন্যে একটা ঘরও পেয়ে গেল সে জ্যাকসন হাইটে। আর একটি বাংলাদেশের ছেলের সঙ্গে রুম শেয়ার করতে হল। ঘর খাওয়া-দাওয়া, পোশাক ইত্যাদিতে চারশো ডলার খরচ হচ্ছিল। দেশে টাকা পাঠিয়েও কিছু কিছু করে সে জমাচ্ছিল। টুপির দোকানেও সম্ভ্রান্ত খদ্দেররা এসে টিপস দিয়ে যান।

শেষপর্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত সরকারি স্বীকৃতিপত্র পেয়ে গেল সে। এর মধ্যে দিয়াগোর সঙ্গে তার কথা হয়েছে। তার পাওনা দিয়াগো দোকানে এসে মিটিয়ে দিয়েছে। পুলিশ তার কোনও হদিশ না পেয়ে কোনও মামলা শুরু করেনি। সেই কালো ড্রাইভারের জেল হয়ে গেছে। স্বস্তি পেল শাহিন।

এক বছর কাজ করল শাহিন। 'হ্যাটস' ছাড়া অন্য দোকানে পার্টটাইম কাজ পেতে অসুবিধে হল না। এই সময়ের পর তার নিজস্ব সঞ্চয় দাঁড়াল দু'হাজার তিনশো ডলার। জ্যাকসন হাইটের একজন ট্রাভেল এজেন্টের কাছ থেকে সে দেশে যাওয়ার টিকিট কাটল যেদিন, সেদিন মনে হল তার চেয়ে সুখী মানুষ পৃথিবীতে নেই।

যাওয়ার আগে আব্বু-আম্মুর জন্যে কী কিনে নিয়ে যাবে ভেবে পাচ্ছিল না শাহিন। জামাকাপড় এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। ওঁরা পরবেন না। পারফিউম নিয়ে গেলে ভাইরাই ব্যবহার করবে, আম্মু ছোঁবেন না। শেষপর্যন্ত একটা মাইক্রোওভেন কিনল সে। বেশ সস্তায় পেয়ে গেল। ইন্ডিয়ান দোকান থেকে কেনা বলে বাংলাদেশে ব্যবহার করা যাবে। আম্মুর খুব কাজে লাগবে জিনিসটা।

বাংলাদেশ বিমান এখন বন্ধ। মাথা উঁচু করে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে এমিরেটসের বিমানে উঠে বসল সে। বিমান ছাড়ার সময় সে গুনগুন করতে লাগল, 'ও আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।'

জিয়া এয়ারপোর্ট থেকে দুটো লাগেজ ট্রলিতে চাপিয়ে যখন সে বেরিয়ে

এল তখন ভরদুপুর। ট্যাক্সিওয়ালারা ছেঁকে ধরল। অনেক দরদস্তুর করার পর একজন ট্যাক্সিওয়ালাকে সে রাজি করাতে পারল ফরিদপুরে যাওয়ার। তাকে ফেরার ভাড়া দিতে হবে। একশো ডলার যখন সাত হাজার টাকা, তখন ওটা গায়ে লাগল না।

ট্যাক্সি ছুটল। শহর ছাড়াতেই গ্রামবাংলা। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল তার। এই যে সে যাচ্ছে তা বাসার কেউ জানে না। সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে। উৎসব শুরু হয়ে যাবে বাসায়। চাষের খেত, পুকুর, গোরু ছাগলের স্বচ্ছন্দ চলাফেরা দেখতে দেখতে তার মনে হল এইসব দৃশ্য থেকে আমেরিকায় মানুষ বঞ্চিত। সে ওখানে টাকার সন্ধানে থেকে গিয়েছিল। বছরের পর বছর যেভাবে কাটিয়েছে তা বাসার কেউ কল্পনা করতে পারবে না। তা সত্ত্বেও টাকা পাঠিয়ে গিয়েছে নিয়মিত। আব্বু লিখেছিল সেই টাকায় দোতলা তুলেছে, কিছু জমি কিনেছে। এতগুলো বছর সে পরিচিতি ছাড়া বাস করেছে আমেরিকায়। মুখে বললেও প্রমাণ করা অসম্ভব ছিল যে সে বাংলাদেশের মানুষ। এখন ভাগ্য তাকে সাহায্য করেছে। পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী দেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার শেষ ধাপ পার হয়েছে সে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। সাময়িক পাসপোর্টের বদলে পাকাপাকি হয়ে হাতে আসবে ওটা। আসুক। মনে মনে সে ধনধান্য পুষ্পভরা বাংলাদেশের সন্তান হয়েই থাকবে।

ফরিদপুর এসে গেল। ইচ্ছে করলেই নাটকের দলের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করা যায়। আনোয়ারভাই এখন কেমন আছেন? নাটক করছেন? বকুলের কি বিয়ে হয়ে গিয়েছে? ক'দিন বাদে ফিরে এসে সবার খোঁজ করতে হবে। শহর থেকে বেরিয়ে গ্রামের রাস্তা ধরতে বলতেই ট্যাক্সি ড্রাইভার আপত্তি জানাল, তার সঙ্গে গ্রামে যাওয়ার কথা হয়নি। অনেক অনুরোধের পর লোকটা রাজি হল। কিন্তু গ্রামে ঢোকার মুখে হরি বাউলের আখড়ার পাশের রাস্তায় বিশাল গর্ত দেখে দাঁড়িয়ে গেল ট্যাক্সি। ড্রাইভার হাতজোড় করল, 'ওই রাস্তায় নামলে গাড়ি আর ফেরত যাবে না।' অতএব সেখানেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে হল।

সুটকেস আর বাক্স নিয়ে নীচে নেমে চারপাশে তাকাল সে। কোনও চেনা লোক নেই। দূরে একটা ভ্যানরিকশা দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে

চিৎকার করল। লোকটা এগিয়ে এল ভ্যানরিকশা নিয়ে, 'কোথায় যাবেন?'

শাহিন পাড়ার নাম বলতেই লোকটা বলল, 'ষাট টাকা দেবেন।'

'ষাট? তুমি কি পাগল? নাকি আমাকে নতুন লোক বলে ভেবেছ?'

'মনে হয় আপনি বহুতদিন এদিকে আসেন নাই। দেশে থাকেন না বিদেশে?'

আর তর্ক করা বৃথা। মাল ভ্যানে তুলে উঠে বসল শাহিন। খানিকটা যেতেই সেই মসজিদটা চোখে পড়ল। চেহারাই বদলে গিয়েছে। ওখানে গেলে অনেকের সঙ্গে দেখা হবে। কত বছর পরে ওঁরা তাকে দেখবেন!

পর পর কয়েকটা দোকান। সেখানে কিছু ছেলে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। তাদের একজনকে দেখে শাহিন চেঁচিয়ে উঠল, 'লতিফ না? এই লতিফ?'

ছেলেটা বুকে হাত রাখল, 'আমাকে বলতেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি লতিফ না।'

'সরি!' তারপরেই খেয়াল হল। লতিফেরও তো বয়স হয়েছে। তার নিজের চেহারার যেমন বদল হয়েছে লতিফেরও হওয়া স্বাভাবিক। লতিফের জন্যই সে শহরে যেতে পেরেছিল। ওখানে না গেলে নাটকের দলে ঢোকা হত না। আমেরিকায় যাওয়া হত না। তাই আজকে সে লতিফের কাছে কৃতজ্ঞ। ওর দেওয়া টাকা শোধ করা হয়নি। সেই যে ওর বোন, কী যেন নাম, হ্যাঁ, আমিনা, যে টিউশনি করে টাকা জমাত, লতিফ যার কাছ থেকে টাকা এনে তাকে দিয়েছিল, সে এখন কোথায়? তাদেরই বয়সি একটা মেয়ে কি এতকাল অবিবাহিতা থাকে?

বাঁক ঘুরতেই দূরে একটা তিনতলা বাড়ি দেখতে পেল শাহিন। ওর দু'পাশে টিনের চালওয়ালা একতলা বাড়ি। তিনতলা পাকা বাড়ি যেন আকাশ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। এত বড় বাড়ি তাদের গ্রামে আগে ছিল না। কার বাড়ি?

'ওটা কার বাড়ি?' জিজ্ঞাসা করল শাহিন?

'ওই বাড়ির নাম আমেরিকান বাড়ি।'

'মানে?'

'সবাই বলে আমেরিকার টাকায় তৈরি। বুঝলেন না? মিঞা সাহেবের ছেলে আমেরিকা থেকে টাকা পাঠায় আর একতলা দোতলা তিনতলা হইয়া যায়।'

চমকে চারপাশে তাকাল শাহিন। তাই তো! এখানেই তাদের বাড়িটা থাকার কথা। সে এতক্ষণ তাদের পুরনো বাড়িটার কথা ভেবে বসেছিল। আব্বু তো লিখেছিলেন নতুন বাড়ির কথা। এয়ারপোর্টের ভেতরে ডলার ভাঙিয়ে টাকা করে নিয়েছিল সে। বাড়ি দেখার আনন্দে ভ্যানওয়ালাকে একশো টাকা দিয়ে দিল। লোকটাও খুশি হয়ে তাকে মাল বইতে দিল না।

ইতিমধ্যে দোতলা এবং তিনতলা থেকে কেউ না কেউ তাকে দেখেছে। গেট খুলে সে ভেতরে পা দেওয়ামাত্র ভাইরা প্রায় একসঙ্গে বেরিয়ে এল, 'আরে! তুমি?'

'চলে আসলাম।'

'কিন্তু একটা খবর দিলে আমরা ঢাকায় যেতাম নিয়ে আসার জন্যে।'

ছোটভাই বলল, 'তোমার চেহারা খুব সুন্দর লাগতেছে। খুব স্মার্ট!'

'ভ্যাট। আব্বু-আম্মু কোথায়?' শাহিন হাসল।

ভাইরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ছোটভাই বলল, 'ভেতরে আসো! একটু রেস্ট নাও। চা বানাবে, না শরবত?'

একটু অবাক হয়ে ভেতরে ঢুকল সে। বেশ বড় বসার জায়গা। মাথায় ঘোমটা দিয়ে তিনজন মহিলা এসে দাঁড়াল একপাশে। ছোট ভাই চেয়ার এগিয়ে দিল। দিয়ে বলল, 'এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়নি। মেজভাবি, সেজভাবি আর আমার ওয়াইফ।'

বলা শেষ হওয়ামাত্র তিনজন এগিয়ে এল শাহিনকে সালাম করতে। 'থাক-থাক' বলেও শাহিন ওটা এড়াতে পারল না। তারপর বউদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আব্বু আম্মু বাসায় নেই?'

দুই সেকেন্ডের মধ্যে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু হল। তিন বউ পাশাপাশি

দাঁড়িয়ে চোখে হাত চেপে কাঁদতে লাগল।

হতভম্ব হয়ে ভাইদের দিকে তাকালেই সেজ ভাই বলল, 'ছয় মাসের মধ্যে দু'জন চলে গেল। আগে আব্বু পরে আম্মু। সবাই বলে আব্বুর শোক আম্মু সহ্য করতে পারেনি। আর যাওয়ার পরে সেই যে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আর সোজা হল না।'

'এসব কথা আমাকে জানাসনি কেন তোরা?' গলা শুকিয়ে গেল শাহিনের।

'তুমি বিদেশে থাকো, শুনলে কষ্ট পাবে তাই আম্মু নিষেধ করেছিল।'

'চমৎকার, কবে, কতদিন আগের ঘটনা?'

'প্রায় চার বছর।'

হঠাৎ খেয়াল হল। ফোন কিনে দেওয়ার কথা বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত যখন কেনা হল, তখন আব্বু তার সঙ্গে কথা বলেনি। বলা হয়েছিল আব্বু ফোনে কথা বলা পছন্দ করে না। আম্মুর সঙ্গে কথা বলার একবারই সুযোগ পেয়েছিল সে। কিন্তু সেদিন আম্মু শুধুই কেঁদে গিয়েছে। একটাও কথা বলতে পারেনি। অথচ এই গত মাসেও সে আব্বুর নামে টাকা পাঠিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর চার বছর পরেও সেই টাকা এরা অম্লানবদনে নিয়ে গিয়েছে!'

'শাহিন? শাহিন আসছে শুনলাম! শাহিন!' বাইরের দরজা দিয়ে লাঠি হাতে নড়বড় করতে করতে ভেতরে এলেন যে বৃদ্ধ তাঁকে চিনতে অসুবিধে হল না শাহিনের। আবদুল চাচা। তার দিকে নজর পড়তেই আবদুল চাচা বললেন, 'তা হলে টাইম পাইলা?'

'আমি জানতাম না চাচা। এরা এসব খবর আমাকে দেয়নি।' শাহিন বলল।

'তাই বলো। গত মাসেও যখন টাকা আসল তখন সবাই বলল, কী ভাল ছেলে দ্যাখো, বাবা-মা নাই তবু ভাইদের টাকা পাঠায়। তুমি এই চার বছর তোমার বাবার কোনও চিঠি পাও নাই। কেন পাও নাই তা ভাবছ?'

'নিজের সমস্যায় এত ব্যস্ত ছিলাম, তা ছাড়া ফোনে যখন এদের

সঙ্গে কথা বলতাম এরা সন্দেহ করার মতো কিছু বলেনি।'

'তোমার প্ল্যান কী?'

'মানে?'

'তোমার বাপ তিনতলা বানাইছে, বিঘা বিঘা জমি কিনছে। কিনছে তোমার মায়ের নামে। তিনি যাওয়ার আগে যে কাগজে সই করছেন তা আদালত স্বীকার করছে যে এইসবের মালিক তোমার তিনভাই। এই তিনজন। আমি অনেক নিষেধ করছিলাম, এরা মানলই না। এদের এক কথা, তুমি নাকি আর এদেশে ফিরবা না। আমেরিকায় মেমসাহেব বিয়া করছ। বলছিলাম, তারে অন্তত ফোনে বলো। বলছিল?'

হাসল শাহিন।

'বিয়াশাদি করছ?'

'না।'

'এই বিষয়-আশয়ের মালিক এরা। তুমি না। আমরা সবাই যা জানি তা আদালত স্বীকার করবে না। তুমি কী করবা?'

আমেরিকা থেকে নিয়ে আসা সুটকেস আর বাক্সটা দু'হাতে তুলে ভাইদের দিকে তাকিয়ে শাহিন বলল, 'চলি।'

ভাইরা পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। আবদুল চাচা পিছন পিছন বেরিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা?'

'চাচা, আপনি তো লতিফকে চেনেন?'

'লতিফ? সে তো এখন ঢাকায়।'

'ও। ওর এক বোন ছিল, আমিনা।'

'হ্যাঁ। সে এখানকার স্কুলে পড়ায়। বিয়াশাদি করে নাই।' আবদুল চাচা বললেন, 'আমার পাশের বাসায় থাকে। আজ ছুটি, ওরে বাসায় পাইবা।'

বাড়ির সামনে দাঁড়াল শাহিন। এখানে একটা একতলা টিনের চালওয়ালা বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে আব্বু-আম্মু তাদের ছেলেমেয়েদের সস্নেহে লালন করেছিলেন। বিদেশে থাকার সময় এই বাড়িটা তার চোখের সামনে পরম শান্তি নিয়ে ফিরে ফিরে আসত। সেই বাড়ি আজ

নেই। পরিচিত গাছপালাগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সে বাইরের লোক।

আবদুল চাচার সঙ্গে একটা ভ্যান রিকশায় বসে আমিনার বাড়িতে পৌঁছাল শাহিন। আবদুল চাচা ডাকলেন, 'মাস্টারনি ও মাস্টারনি, এদিকে আসো।'

শাহিন দেখল, একজন গম্ভীর মুখের মহিলা, নাকের নীচের দিকে চশমা, বারান্দায় বেরিয়ে এসে শাহিনকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

আবদুল চাচা জিজ্ঞাসা করল, 'এরে চেনো?'

'কবে আসলা?' আমিনা জিজ্ঞাসা করল।

'আজই।' শাহিন বলল।

'ও জানত না ওর টাকার তৈরি বাড়িঘর ভাইরা নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করিয়ে নিয়েছে। ও এখন ওই বাড়িতে অতিথির মতো থাকতে পারে।'

'জানি।' আমিনা বলল, 'লতিফ অনেক চেষ্টা করেও আপনার ঠিকানা ফোন নাম্বার জোগাড় করতে পারেনি।'

'লতিফ এখন ঢাকায়?'

'হ্যাঁ। দুটো বাচ্চা ওর।'

'আচ্ছা!' বাক্সটা সাইকেল ভ্যান থেকে নামিয়ে বারান্দায় রাখল শাহিন, 'সামান্য জিনিস। ব্যবহার করলে খুব খুশি হব।'

'কী এটা?' আমিনা জিজ্ঞাসা করল।

'আম্মুর জন্যে এনেছিলাম। মনে হল আপনাকে দিলে আম্মু খুশি হবে।'

'কেন?'

'সব কেন-র জবাব হয় না। আচ্ছা, চলি।' আবদুল চাচার দিকে ঘুরে দাঁড়াল শাহিন, 'ভাল থাকবেন চাচা।'

'কোথায় যাবা?'

'দেখি!'

সে ভ্যান রিকশায় উঠতে যাচ্ছিল, আমিনা এগিয়ে এল, 'শুনুন। লতিফ আমাকে টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছে।'

'ভাল। কিন্তু সেদিন আপনি শুধু টাকা দেননি, পৃথিবীটাকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আদাব।'

ভ্যান রিকশা এখন গ্রামের প্রান্তে। শাহিন অবাক হয়ে দেখল তাকে নিয়ে আসা ট্যাক্সি রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। বনেট খোলা। ড্রাইভার উপুড় হয়ে ইঞ্জিনে কিছু করছে।

তাকে দেখতে পেয়ে লোকটা খেঁচিয়ে উঠল, 'এই জন্য এতদূরে আসতে চাই না। গাড়ি আর একটু হলেই যেত।'

'গাড়ি ঠিক হয়েছে?'

'পাঁচ মিনিট।'

ভ্যান ছেড়ে দিল শাহিন। দূরে তাদের গ্রাম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এই গ্রামে আর হয়তো আসা হবে না। আজ সে এখানে শুধুই অতিথি। অতিথি কখনও মালিকানা পায় না। সে এখানে বহিরাগত। তিরতিরে কষ্টটা বুকের পাঁজরায় ছোবল মারছিল। শ্বাস ভারী হয়ে আসছে। সে বহিরাগত। বাইরের লোক। পকেটে আমেরিকায় মাথা উঁচু করে বাস করার পরিচয়পত্র আছে। কিন্তু সেখানেও তো সে বহিরাগত। আমৃত্যু সে জানবে আমেরিকা তার দেশ নয়।

'আসুন। কোথায় যাইবেন?'

'এয়ারপোর্ট।'

'সেকী! আজই তো এদেশে আসলেন?' ট্যাক্সি ড্রাইভার অবাক।

'এ দেশে জায়গা হল না ভাই।'

ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ট্যাক্সি ছুটছিল বেশ জোরে। পিছনের সিটে বসে চোখ বন্ধ করল শাহিন। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের ভিতরটা গুলিয়ে উঠল। সর্বাঙ্গে ঝিমঝিম ভাব, মনে হচ্ছিল বমি হবে। সে চোখ খুলে সোজা হয়ে বসে ড্রাইভারকে বলল, 'একটু থামান ভাই'। ট্যাক্সিওয়ালা শুনতে পায়নি কথাগুলো। শাহিন তার পিঠে হাত দিয়ে কথাগুলো আবার উচ্চারণ করতে ধীরে ধীরে হাইওয়ের একপাশে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে গেল।

দ্রুত দরজা খুলে নীচে নামল শাহিন। খানিকটা পিছনে হেঁটে উবু হয়ে

বসল সে, মাথা ঘুরছিল তার। অ্যাসিড হয়ে গেলে শরীর যেমন হয়। সে বমি করার চেষ্টা করল। শব্দ হল কিন্তু কিছুই বের হল না। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতেই আচমকা হাউহাউ কান্না ছিটকে বের হল শরীর থেকে। শব্দটাকে গিলবার চেষ্টা করে পারল না শাহিন। তার সামনে আদিগন্ত সবুজ ফসলের মাঠ, মাথার উপরে বাংলাদেশের স্নিগ্ধ নীল আকাশ। কিন্তু সেসব সে দেখতে পারছিল না। শরীরের প্রতিটি কোণ থেকে কান্না ছিটকে চলে আসছে বুকে, বুক তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছে গলায়।

'ভাই!' পিঠে স্পর্শ পেতেই শাহিন সজাগ হল। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল। ড্রাইভার বলল, 'এই বোতলের পানিতে মুখ ধুয়ে নিন।'

অনুরোধ মান্য করল শাহিন। তখনও বুকের পাঁজরে কাঁপন চলছিল।

'কুয়ার পানি। খুব শীতল। খেলে আরাম পাবেন।'

এক ঢোঁক, দু' ঢোঁক পান করল সে। পানি ছড়িয়ে যাচ্ছে শরীরের ভিতরে। প্রতিটি কোণে, যারা কান্নার জন্ম দিয়েছিল।

শাহিন বুঝল, সারা জীবন তাকে এই কান্নাকে বহন করতে হবে।
